
কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো

4.4

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ



হেমেন্দ্রকুমার রায়

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

COUNT OF MONTRICRISTO
CODE NO. 4-29-041

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫
১০

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০


উপহার

আলেকজান্দার ডুমা

পৃথিবীতে অনেক কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখা যায় কিন্তু পিতা ও পুত্র দুজনেই বড় সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন এটা বড় একটা শোনা যায় না। এ ঘটনারও ব্যতিক্রম দেখা যায় আলেকজান্দার ডুমার জীবনে। তাঁদের দুজনের নামও এক। এখানে বাবার কথাই বলব। তিনিই 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টোর' বিখ্যাত ফরাসী লেখক।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই এই লেখকের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের চার বৎসর পরেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কাজেই অতিশয় দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়েই তাঁর বাল্যজীবন কাটে। কিন্তু এই দুঃখ কষ্টের অনুভূতি তাঁর বাল্যকালেই সাহিত্যরচনার অনুপ্রেরণা জোগায়। প্রথম জীবনে তিনি নাটক রচনা করতে শুরু করেন, পরে উপন্যাস রচনায় হাত দেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর যুগান্তকারী রচনা 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' প্রকাশিত হয়।

ডুমা তাঁর জীবদ্দশাতেই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। লোকে তাঁর লেখা পড়বার জন্য ব্যগ্র উৎসুক হয়ে থাকত। তিনি একবার এক ভ্রমণ কাহিনী লেখার বায়না হিসাবে এক কাগজওয়ালার কাছ থেকে বিস্তর টাকা আগাম নেন। স্থির হল তিনি সিসিলি যাবেন বেড়াতে এবং সেখান থেকেই যেমন যেমন দেখবেন, তেমনি তেমনি লিখে পাঠাবেন। কথা ছিল তাঁর সঙ্গে তাঁর শিল্পী বন্ধু জাদিন যাবেন। আর যাবে জাদিনের নিত্য সঙ্গী কুকুর। কিন্তু কোন কারণে সেই বন্ধুর যাওয়া হল না। ডুমাকে একাই রওনা হতে হল।

ডুমা পড়লেন মহা বিপদে। তিনি কাগজওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা নিতেন শব্দের সংখ্যা হিসাবে। যত বাড়িয়ে লিখতে পারবেন ততই তাঁর লাভ। ডুমা আর কি করবেন, শিল্পী বন্ধুকে ও তাঁর কুকুরকে কল্পনা করেই তিনি দিনের পর দিন মনগড়া ভ্রমণ কাহিনী লিখে পাঠাতে লাগলেন।

সেই কাহিনী খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু এদিকে শিল্পী বন্ধু জাদিন পড়লেন মহা বিপদে। কেউ তাঁকে আর জাদিন বলে স্বীকার করে না। কারণ সবাই জানে জাদিন ডুমার সাথে সিসিলিতে আছেন।

এমন শক্তিশালী ছিল আলেকজান্দার ডুমার রচনা। কল্পনাকে তিনি বাস্তবের চেয়েও সত্য করে তুলতেন লেখনীর গুণে।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দার ডুমার মহাজীবনের অবসান ঘটে।

———



হ্যাঁ, দণ্ডই দেব আমি!

কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো

এক

মার্সেঈ বন্দর।

লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে সেদিন বন্দরটা।

বিদেশ থেকে কোন বাণিজ্য জাহাজ ফিরে আসবার দিন এরকম ভিড় হয়েই থাকে।

খবর এসেছিল, মোরেল এ্যাণ্ড সন-এর ফারাওঁ নামে জাহাজখানা বন্দরে আসবে ঐদিন। তাই অতো লোকজন।

জাহাজের মালিক মঁসিয়ে মোরেলও ছিলেন সেই জনতার মধ্যে। তাঁর আগ্রহাকুল দৃষ্টি তখন দূর সমুদ্রের দিকে প্রসারিত। কখন বন্দরে ঢুকবে জাহাজ—তাঁর মনে কেবল সেই চিন্তা।

কিছুক্ষণ পরেই জাহাজখানা দেখতে পাওয়া গেল।

ধীরে ধীরে জেটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ফারাওঁ।

জাহাজ তীরে এসে নোঙর ফেলবার আগেই মঁসিয়ে মোরেল জেটির কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন। মালিককে দেখতে পেয়েই জাহাজের একজন খালাসী একগাছা দড়ি ছুঁড়ে দিল তাঁর দিকে।

দড়িগাছা ধরে মঁসিয়ে মোরেল সুদক্ষ নাবিকের মত ঝুলতে ঝুলতে ডেক-এর উপরে উঠে পড়লেন।

ডেক-এ উঠে প্রথমেই তাঁর দেখা হ'লো এডমণ্ড দান্তের সঙ্গে। সে তখন ব্যস্তভাবে খালাসীদের নির্দেশ দিচ্ছিলো নোঙর ফেলবার ব্যাপারে।

এডমণ্ড বয়সে তরুণ। সুশ্রী ছিপছিপে চেহারা। অভিজ্ঞ কাপ্তেনের মতই হুকুম চালাচ্ছিল সে।

মঁসিয়ে মোরেল তার কর্মকুশলতা দেখে খুশী হলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন তার কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মুখখানা ওরকম বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন এডমণ্ড, খবর সব ভাল তো?

—আজ্ঞে না, খবর খুবই খারাপ।

—খারাপ খবর! কি হয়েছে বলো তো? মালের কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

—আজ্ঞে না, মাল ঠিকই আছে। কিন্তু আমাদের কাপ্তেন···

—কাপ্তেন! কি হয়েছে তাঁর?

—তিনি বেঁচে নেই।

—কি বললে? কাপ্তেন লাকমেয়ার—আমার বিশ্বস্ত বন্ধু কাপ্তেন লাকমেয়ার বেঁচে নেই? কি হয়েছিল তাঁর? সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন কি?

—না মঁসিয়ে, 'ব্রেন ফিভার' রোগে মারা গেছেন তিনি।

এই পর্যন্ত ব'লেই খালাসীদের দিকে তাকিয়ে এডমণ্ড চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—না না, ওভাবে নয়, দাঁড়াও আমি আসছি।

মঁসিয়ে মোরেলের দিকে তাকিয়ে সে বললো—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, নোঙর ফেলার ব্যবস্থা ক'রে এক্ষুনি ফিরে আসছি আমি।

এই ব'লেই এডমণ্ড চ'লে গেল ওখান থেকে।

এডমণ্ড চ'লে যেতেই আর একটি যুবক-কর্মচারী এগিয়ে এলো মঁসিয়ে মোরেলের কাছে। যুবকটির নাম ড্যাংলার।

মঁসিয়ে মোরেলকে অভিবাদন ক'রে ড্যাংলার বললো—খবর শুনেছেন কি?

—কাপ্তেনের মৃত্যুর কথা বলছো তো? হ্যাঁ, এডমণ্ডের মুখে এইমাত্র শুনলাম সে কথা।

—আর কিছু শুনেছেন?

—কি?

—এল্‌বা দ্বীপে যাবার কথা? কাপ্তেনের মৃত্যু হ'তে না হ'তেই এডমণ্ড ইচ্ছামত কাজ করতে আরম্ভ করেছে। কোন কাজ না থাকলেও পুরো দেড় দিন এল্‌বা দ্বীপে কাটিয়ে এসেছে।

—এল্‌বা দ্বীপে! সেখানে গিয়েছিল কেন?

—তা জানি না। হাওয়া খাওয়া ছাড়া আর কি কাজ থাকতে পারে সেখানে?

ড্যাংলারের মুখে এই খবর শুনে মঁসিয়ে মোরেল বেশ একটু বিরক্ত হয়েই এডমণ্ডের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—এডমণ্ড !

এডমণ্ড তখন নোঙর ফেলার ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত। সে বললো—একটু অপেক্ষা করুন, হাতের কাজটা সেরেই যাচ্ছি।

ড্যাংলার বললো—দেখলেন তো! ও এখনি নিজেকে কাপ্তেন ব'লে ধ'রে নিয়েছে।

—ঠিকই করেছে। এ জাহাজের কাপ্তেন ওকেই করবো ঠিক করেছি আমি।

মালিকের মুখে এই কথা শুনে ড্যাংলারের মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। অতি কষ্টে মনের ভাব দমন ক'রে সে বললো—কিন্তু এখনও তো আপনি ওকে কাপ্তেনের পদে নিযুক্ত করেননি ?

—তা করিনি বটে, তবে দু'একদিনের মধ্যেই করবো।

ড্যাংলারের মুখের উপর আবার ঘনিয়ে উঠলো একটা কালো ছায়া। সে তখন ধীরে ধীরে নিজের কেবিনের দিকে চ'লে গেল। এই সময় এডমণ্ড ফিরে এসে বললো, একটু দেরী হ'লো ব'লে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি কেন আমায় ডাকছেন ?

—জাহাজ নিয়ে এল্‌বা দ্বীপে গিয়েছিলে তুমি ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—কাপ্তেনের হুকুমে।

—কাপ্তেনের হুকুমে !

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে। কাপ্তেন মারা যাবার আগে আমার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়ে এল্‌বার কোন লোকের কাছে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী কাপ্তেনের সেই অনুরোধকে জীবিত কাপ্তেনের হুকুম মনে ক'রেই কর্তব্যবোধে সে হুকুম পালন করেছি আমি।

—কার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলে সেই প্যাকেট ?

—মার্শাল বার্ট্রাণ্ডের হাতে।

—মার্শাল বার্ট্রাণ্ডের হাতে! চম্‌কে উঠলেন মঁসিয়ে মোরেল এডমণ্ডের মুখে এই কথা শুনে। তিনি তখন গলা একটু খাটো ক'রে বললেন—সম্রাটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হয়েছিল।

—কি বললে! দেখা হয়েছিল সম্রাটের সঙ্গে?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে।

—তুমি কি বললে তাঁকে?

—আমি বলবো কেন, তিনিই আমাকে বললেন।

—কি বললেন তিনি তোমাকে?

—তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমরা কবে মার্সেঈ ছেড়েছি, কোন্ পথ ধ'রে গেছি—এই সব। তিনি হয়ত আমাকে জাহাজের মালিক মনে করেছিলেন, কিন্তু আমি যখন বললাম যে, জাহাজের মালিক আমি নই, আমি একজন 'মেট' মাত্র—জাহাজের মালিক ফ্রান্সের মোরেল এ্যাণ্ড সন, তখন তিনি খুশী হয়ে বললেন, মোরেল পরিবারকে তিনি চেনেন; এই পরিবারের একজন ছিলেন তাঁর সেনাপতি।

—হ্যাঁ, পলিকার মোরেল, আমার কাকা!

এই ব'লেই খুব চাপা গলায় তিনি আবার বললেন—তুমি খুব ভাল কাজ করেছ এডমণ্ড! কিন্তু এসব কথা কোন রকমে ফাঁস হ'লে আর রক্ষা থাকবে না, মহা বিপদ হবে তা হ'লে।

এডমণ্ড আশ্চর্য হয়ে বললো—বিপদ হবে! বলেন কি? আমি ছিলুম একটি প্যাকেটের বাহক মাত্র, প্যাকেটের ভিতর কি ছিল, তাও আমি জানি না। এর জন্যে আমার কোনো বিপদ হ'তে পারে ব'লে তো মনে হয় না···

এই সময় একজন খালাসীকে আসতে দেখে এডমণ্ড বললো—আমি চল্‌লাম মঁসিয়ে, ওরা বোধ হয় আমাকেই খুঁজছে।

এডমণ্ড চ'লে যাওয়ার উপক্রম করতেই মঁসিয়ে মোরেল বললেন—হ্যাঁ, আর একটি কথা!

—কি কথা মঁসিয়ে ?

—সেই প্যাকেটের কথা জাহাজের অ'র কেউ জানে কি ?

—না।

মঁসিয়ে মোরেল বললেন—আচ্ছা তুমি যেতে পার।

সে চলে যেতেই ড্যাংলার আবার এলো মঁসিয়ে মোরেলের কাছে। বললো—এল্‌বা দ্বীপে যাওয়া সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ ও দিলো ?

—সে খবরে তোমার কি দরকার বাপু ?

মালিকের কথায় ঘাবড়ে গিয়ে ড্যাংলার আমতা আমতা ক'রে বললো—না···মানে···সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পেরেছে কিনা সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম···মানে, এডমণ্ড আমার বন্ধু কিনা···

মোরেল বললেন—হ্যাঁ, তার কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। —তোমার আর কোন কাজ আছে ?

—আজ্ঞে না।

—বেশ তা হ'লে এখন যেতে পার।

ড্যাংলার আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না ক'রে ওখান থেকে স'রে পড়লো।

ড্যাংলার চ'লে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এডমণ্ড আবার ফিরে এলো ওখানে।

মঁসিয়ে মোরেল তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন—কি ? কাজ শেষ হ'লো তোমার ?

—হয়েছে, স্যর।

—আর এখানে কিছু করবার নেই তো ?

—না, সব কাজই শেষ ক'রে এসেছি।

—তা হ'লে চলো আমার সঙ্গে, আমার ওখানেই ডিনার খাবে। আজ।

—আমাকে ক্ষমা করুন মঁসিয়ে! আগে বাবার সঙ্গে দেখা না করে আমি কোথাও যেতে পারবো না।

মঁসিয়ে মোরেল খুশী হয়ে বললেন—তোমার পিতৃভক্তি দেখে খুশী

হলাম। বেশ, তুমি যাও, কিন্তু বাবার সাথে দেখা করবার পর আমার কাছে আসতে পারবে ত?

এডমণ্ড মাথা নত ক'রে বললো—আমাকে আরও একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে, স্যর।

মঁসিয়ে মোরেল সহাস্যে বললেন—ও বুঝেছি, তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ মার্সেদেস-এর কথা বলছো তো? হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করবে বৈকি। ভাল কথা, তোমার টাকার দরকার আছে?

—না স্যর! আমার হাতে তিন মাসের মাইনে জমেছে।

—বল কি! তুমি ত খুব হিসেবি ছেলে দেখছি।

—আমার বাবা বড় গরীব সে কথাটা ভুলে যাবেন না, স্যর।

—বড় খুশী হ'লাম তোমার কথা শুনে এডমণ্ড। আমার কাছে তোমার আর কিছু বলবার আছে?

—আমি দিন কয়েকের ছুটি চাইছি।

—বিয়ের জন্য বুঝি?

—হ্যাঁ স্যর, তবে বিয়ে ছাড়া আরো একটা কাজ আমাকে করতে হবে। আমাকে একবার প্যারিসে যেতে হবে।

—বেশ, তোমার ছুটি মঞ্জুর। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসেই দেখা করতে ভুলো না যেন। মনে রেখো, ভবিষ্যতে তুমিই হবে ফারাওঁ জাহাজের কাপ্তেন।

—কাপ্তেন! আমি। কি বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি এডমণ্ড। পরবর্তী বাণিজ্য যাত্রায় তুমিই হবে ফারাওঁয়ের কাপ্তেন।

মঁসিয়ে মোরেলের মুখে এই অভাবনীয় কথা শুনে এডমণ্ডের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল। সে বললো—আমি কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না স্যর। আমি আমার বাবা এবং মার্সেদেসের তরফ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দুই

ফারাওঁ জাহাজ যে মার্সেঈ-এ ফিরে এসেছে, এডমণ্ডের বাবার কাছে সে খবর তখনও পৌঁছায়নি। এসিজ-দ্য-মিলানের পনের নম্বর বাড়ীর চারতলায় তাঁর ছোট্ট ঘরখানায় ব'সে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি।

হঠাৎ পিছন থেকে কে তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে অতি পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলেন তিনি—বাবা!

বৃদ্ধ চমকে উঠে ফিরে তাকালেন। এডমণ্ডকে দেখেই তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন, হঠাৎ থরথর ক'রে কেঁপে উঠে ছেলের হাতের উপরেই এলিয়ে পড়লেন।

এডমণ্ড ভয় পেয়ে গেল তাঁর অবস্থা দেখে। সে বললো—তোমার কি কোন অসুখ করছে বাবা?

— না বাবা, অসুখ আমার করেনি। এতদিন পরে হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেয়ে একটু···যাই হোক, তোমার খবর বলো! শরীর ভাল ছিল তো তোমার?

হ্যাঁ বাবা, শরীর ভালই ছিল। তাছাড়া আরও একটি সুখবর তোমাকে শোনাচ্ছি। আমি এখন কাপ্তেন। ফারাওঁ জাহাজের কাপ্তেন এখন তোমার ছেলে। এরপর থেকে আমাদের আর কোন দুঃখকষ্ট থাকবে না বাবা!

আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হ'লো না। তাঁর দু'চোখের কোণে দেখা গেল দু'ফোঁটা অশ্রু।

বাবাকে আরও আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে এডমণ্ড বললো—মদের বাক্সের চাবিটা দাও তো বাবা! আজ আমি নিজ হাতে মদ পরিবেশন করবো তোমাকে।

—মদ তো ঘরে নেই বাবা!

—মদ নেই! তার মানে? তোমার খরচের জন্য আমি তো দু'শ ফ্রাঙ্ক রেখে গিয়েছিলাম যাবার সময়।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন—ঠিকই বলেছো বাবা! কিন্তু তুমি বোধ হয়

ভুলে গিয়েছিলে যে, তোমার বন্ধু কাদারুজের কাছে এক'শ চল্লিশ ফ্রাঙ্ক দেনা ছিল আমাদের।

—তুমি কি ঐ টাকা থেকে কাদারুজের দেনা শোধ করেছ নাকি?

—না করলে চলবে কেন বাবা?

—কি সর্বনাশ! তাহলে এই তিন মাসে তোমার সম্বল ছিল মাত্র ষাট ফ্রাঙ্ক?

বৃদ্ধ মৃদুস্বরে বললেন—হ্যাঁ।

এই কথা শুনে এডমণ্ড তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বললো—আমাকে তুমি ক্ষমা করো—বাবা!

বৃদ্ধ বললেন—ছিঃ বাবা! তাতে কি হয়েছে? তুমি তো জানো, আমার বেশী টাকার দরকার হয় না। ষাট ফ্রাঙ্কেই আমার দিব্যি চ'লে গেছে। তাছাড়া তুমি যখন এসে পড়েছো, তখন আর চিন্তা কি?

এডমণ্ড দাঁড়িয়ে উঠে বললো—সত্যিই বাবা, আর আমাদের কোন চিন্তা নেই। এই দেখ, কত টাকা আমি নিয়ে এসেছি।

এই ব'লেই পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের ক'রে টেবিলের উপরে রাখলো সে।

বৃদ্ধ নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। সবিস্ময়ে বললেন—এত টাকা?

এডমণ্ড বললো—হ্যাঁ বাবা, এ সবই এখন তোমার। এই টাকা নিয়ে আজই তোমার দরকারী জিনিসপত্তর কিনে নাও। কাল আরও আনবো। এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে এডমণ্ড আবার বললো—ছেলে হয়ে বাপকেই যদি সুখী করতে না পারলাম তাহ'লে তো জীবনই বৃথা। কালই আমরা একটা চাকর রাখবো, আর···

এই সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

এডমণ্ড বললো—কে যেন আসছে ব'লে মনে হচ্ছে বাবা।

বৃদ্ধ বললো—বোধহয় কাদারুজ।

বৃদ্ধের কথাই ঠিক। কাদারুজই বটে। কাদারুজের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে ওখানে দরজীর কাজ করতো।

ঘরে এসেই সে একগাল হেসে বললো—কি খবর এডমণ্ড? ভাল আছো তো? ড্যাংলারের কাছে তোমার খবর পেয়েই ছুটে এলাম দেখা করতে।

—ড্যাংলারের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে নাকি?

—আছে বৈ কি! সে আমার বিশেষ বন্ধু।

এই সময় এডমণ্ডের বাবা বললেন—সত্যিই, কাদারুজ বড় ভাল ছেলে। তুমি ফিরে এসেছো শুনে ও কত খুশী হয়েছে দেখলে?

কাদারুজ বললো—কেবল আমি কেন, এ খবর পেলে আরও একজন খুব খুশী হবে।

বৃদ্ধ সহাস্যে বললেন—মার্সেদেস-এর কথা বলছ ত? হ্যাঁ, সে তো খুশী হবেই। এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে কতকটা আত্মগত-ভাবেই তিনি আবার বললেন—কবে যে তাকে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে আনবো, আমি সব সময় কেবল সেই কথাই ভাবি।

কাদারুজ বললো—সত্যিই মার্সেদেস-এর মত মেয়ে হয় না। তবে বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শেষ ক'রে ফেলতে বলছি আমি।

কাদারুজের এই কথায় এডমণ্ড বললো—কেন বলো তো?

—না, এমনই, মানে তাকে বিয়ে করবার জন্য আরও দু-একজন লোক ঘুর ঘুর করছে কি না।

—তাই নাকি? কে কে বল তো?

কাদারুজ হেসে বললো—সে কথা নাইবা শুনলে। তবে মার্সেদেস যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না একথা ঠিক। যাই হোক, আর সব খবর বলো শুনি।

—খবর আর কি! আমি ফারাওঁ জাহাজের কাপ্তেন নিযুক্ত হয়েছি।

—কাপ্তেন! তুমি কাপ্তেন হয়েছো! কাদারুজের চোখে মুখে ফুটে উঠলো বিস্ময়।

এডমণ্ডের এই সৌভাগ্যের কথা শুনে ঈর্ষাও হ'লো তার মনে। তার মনে হ'লো যে, কাপ্তেন হয়ে এডমণ্ড আর বোধ হয় মিশতেই চাইবে না তার সঙ্গে।

এরপর আর গল্প জমলো না ওদের মধ্যে। দু'চারটে কথার পরেই কাদারুজ বিদায় নিলো এডমণ্ডের কাছে।

এডমণ্ডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতেই হঠাৎ ড্যাংলারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কাদারুজের।

ড্যাংলার বললো—কি ব্রাদার! দেখা হ'লো এডমণ্ডের সঙ্গে?

—হ'লো বৈকি! অনেক টাকা নিয়ে এসেছে দেখলাম।

—ছোকরার বরাত ভাল হে, জাহাজ এসে ঘাটে লাগতে না লাগতেই একেবারে কাপ্তেনের পদ পেয়ে গেল।

কাদারুজ বললো—তা যা বলেছো। এর পর বোধ হয় আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চাইবে না ও। জাহাজের কাপ্তেন হয়ে ও মেলামেশা করবে বড়লোকদের সঙ্গে।

দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ড্যাংলার বললো—আমি বেঁচে থাকতে এডমণ্ড কোনদিনই কাপ্তেন হ'তে পারবে না। হ্যাঁ ভালো কথা, এইবার বোধ হয় মার্সেদেস-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবে ও।

—সেইটেই তো স্বাভাবিক।

—মার্সেদেস-এর কথা তুমি কিছু জানো?

—কিছু-কিছু জানি বৈকি। কেবল এডমণ্ড নয়, আর এক ছোকরাও মার্সেদেসকে বিয়ে করতে চায়। তার নাম ফার্নান্দ্। ছোকরা রোজ এসে হাজিরা দিচ্ছে মার্সেদেস-এর বাড়িতে।

—কি রকম বুঝছো?

—সে গুড়ে বালি। মার্সেদেস এডমণ্ডকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে রাজী নয়।

—ফার্নান্দ্-এর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

—তা আছে।

—আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে পার?

—কেন বলো তো?

—না, মানে—দেখতাম তার প্রেমের গভীরতা কতখানি।

—তাতে লাভ?

—লাভ না থাক, ক্ষতিও তো নেই ! ধরো যদি এডমণ্ডের সঙ্গে মার্সেদেস-এর বিয়ে বন্ধ ক'রে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারি।

—বলো কি ! পারবে ?

—পারবো ব'লেই তো মনে হয়।

—তা যদি পার তাহ'লে খুবই ভাল হয়। ছোকরার অহংকার আমার সহ্য হচ্ছে না। একে কাপ্তেন তাতে আবার মার্সেদেস-এর মত সুন্দরী বউ।

—ও দুটো থেকেই আমি তাকে বঞ্চিত করবো, এ তুমি দেখে নিও কাদারুজ।

তিন

কাটালান।

মার্সেঈ-এর উপকণ্ঠে একখানি ছোট্ট গ্রাম। এই সুন্দর গ্রামখানার প্রতি এডমণ্ডের আকর্ষণ খুব বেশী, কারণ এই গ্রামেরই একখানি ছোট্ট বাড়ীতে থাকে মার্সেদেস।

বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এডমণ্ড ছুটেছিল সেই গ্রামের দিকে। মনে তার আশা ও আনন্দের দোলা। দীর্ঘ তিন মাস পরে আজ সে আবার দেখা পাবে তার প্রিয়তমার।

এদিকে মার্সেদেস-এর ঘরে তখন ফার্নান্দ্ এসে জাঁকিয়ে বসেছে। উদ্দেশ্য তার মহৎ, অর্থাৎ—মার্সেদেসকে বিয়ে করতে চায় সে। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে সে—মত পরিবর্তন করাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মার্সেদেস-এর সেই এক কথা, এডমণ্ড ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। সেদিনও ঐ একই উদ্দেশ্যে শুভাগমন হয়েছিল ফার্নান্দের, সে বলছিল—ইস্টারের ছুটি এসে পড়লো। বলোতো, এই ছুটিতেই···

বাধা দিয়ে মার্সেদেস বললো—আমি তো তোমাকে বহুবার বলেছি যে, এডমণ্ড ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না।

—কিন্তু তোমার মা তো মত দিয়েছেন এ বিয়েতে। তাছাড়া আমি কোন্‌দিক দিয়ে তোমার অনুপযুক্ত? তুমি জানো যে তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব···তোমাকে···

—এসব তুমি কি বলছ ফার্নান্দ্! আমি তোমাকে শেষ বারের মত বলছি, এসব কথা আমাকে আর কখনও তুমি বলতে এসো না।

—এই তোমার শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—এডমণ্ড যদি মারা যায়?

—তা হ'লে আমিও বাঁচব না।

—সে যদি তোমাকে ভুলে যায়?

—কি বললে ? এডমণ্ড আমাকে ভুলে যাবে ? অসম্ভব।

ঠিক এই সময় ঘরের বাইরে এডমণ্ডের আনন্দমুখর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মার্সেদেস !"

মার্সেদেস আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠলো ! এডমণ্ড ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

তাকে দেখেই মার্সেদেস ছুটে গেল তার কাছে। বললো—এডমণ্ড প্রিয়তম, কখন এলে ?

—আজই, কিছুক্ষণ আগে। বাবার সঙ্গে দেখা ক'রেই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। মার্সেদেস আবেগভরে এডমণ্ডের হাত ধ'রে নিয়ে এলো চেয়ারের দিকে।

এদিকে ফার্নান্দ্ এর মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছে। প্রণয়ীযুগলের এই মিলনদৃশ্য তার বুকের মধ্যে শেলের মত বিঁধছে। নিশ্চল কাঠের পুতুলের মত বসে আছে সে।

এই সময় হঠাৎ এডমণ্ডের চোখ পড়লো ফার্নান্দ্-এর উপর। সে জিজ্ঞাসা করলো—ইনি কে ?

মার্সেদেস বললো—আমার বন্ধু।

—তোমার বন্ধু ! তা হ'লে তো আমারও বন্ধু ! করমর্দন করবার জন্যে সাদরে হাত বাড়িয়ে দিলো এডমণ্ড। ফার্নান্দ্ কিন্তু এডমণ্ডের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে কোন আগ্রহই দেখালো না।

এডমণ্ড বিস্মিতভাবে বললো—একি ! আপনি কি আমাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করতে চান না নাকি ?

মার্সেদেস ভৎ‍র্সনাভরা কণ্ঠে বললো—ফার্নান্দ্ !

ফার্নান্দ্ তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এডমণ্ডের সঙ্গে করমর্দন ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

ফার্নান্দ্‌কে ঐভাবে চ'লে যেতে দেখে এডমণ্ড আশ্চর্য হয়ে বললো—সেকি ! তোমার বন্ধু যে কথা না ব'লেই চ'লে গেল ?

মার্সেদেস তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো—তাই তো দেখলাম।

* * * *

পাগলের মত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলছিলো ফার্নান্দ্। তার মনের মধ্যে তখন ভেসে উঠেছে মার্সেদেস-এর হাসিমাখা মুখখানা !

"এডমণ্ড দান্তে ! ঐ লোকটাই আমার সকল সুখের পথে কাঁটা —যেমন ক'রে হোক ঐ কাঁটাগাছকে তুলে ফেলতেই হবে পথ থেকে" —এই সব কথা ভাবতে ভাবতে চলছিলো ফার্নান্দ্।

—ফার্নান্দ্! ফার্নান্দ্ শোনো !

কাদারুজের আহ্বান।

ফার্নান্দ্ সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য ক'রে মুখ ফিরাতেই দেখতে পেলো পাশের রেস্তোরাঁ থেকে কাদারুজ তাকে ডাকছে। সে তাকাতেই কাদারুজ বললো—কী ব্যাপার ফার্নান্দ্। পাগলের মত ছুটছো কোথায় ? এদিকে এসো না।

ফার্নান্দ্ এগিয়ে গেলো রেস্তোরাঁর দিকে। রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই সে দেখলো যে কাদারুজের সঙ্গে আরও একটি যুবক ব'সে আছে। কাদারুজ পরিচয় করিয়ে দিল—এঁর নাম ড্যাংলার—আমার বিশেষ বন্ধু—ফারাওঁ জাহাজের চীফ্ ক্লার্ক।

—ফারাওঁ জাহাজের চীফ্ ক্লার্ক। আপনি তাহ'লে এডমণ্ড দান্তেকে চেনেন নিশ্চয়ই ? জিজ্ঞাসা করলো ফার্নান্দ্।

ড্যাংলার বললো—চিনি বৈকি সেই হামবড়াটাকে।

—হামবড়া ! বেশ বলেছেন কথাটা ! বলতে বলতে কাদারুজের পাশের চেয়ারখানায় ব'সে পড়লো সে !

এইসময় কাদারুজ হঠাৎ ইয়ার্কি ক'রে বললো—কি হে ব্রাদার, মার্সেদেস কি তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি তোমাকে ?

ড্যাংলার বললো—যাও যাও ! বাজে বোকো না। এমন সুন্দর চেহারা যার, তাকে কি কোন মেয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে ?

ফার্নান্দ্ বললো—আর সুন্দর চেহারা ! আমার সব আশাই ধূলোয় মিশে গেছে আজ !

ড্যাংলার বললো—যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে আপনার

দুঃখের কথাটা দয়া ক'রে বলুন না আমাকে! হয়তো আমার দ্বারা কোন উপকার হ'তেও পারে আপনার।

ড্যাংলারের কথায় ফার্নান্দ্ হতাশ ভাবে বললো—অসম্ভব, মঁসিয়ে ড্যাংলার, অসম্ভব! আপনাদের ঐ এডমণ্ড আজ আমার সব আশা ভেঙে দিয়েছে।

এই সময় মার্সেদেস-এর হাত ধ'রে এডমণ্ডকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে ফার্নান্দ্ ব'লে উঠলো—ঐ দেখ কাদারুজ, আমার সব আশা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এডমণ্ড!

কাদারুজ ওদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, পরক্ষণেই ছুটে বাইরে গিয়ে এডমণ্ডকে ডাকলো—এডমণ্ড!

এডমণ্ড আর মার্সেদেস উভয়েই ফিরে তাকালো তার দিকে।

এডমণ্ড বললো—কী ব্যাপার? এখানে কি করছো?

কাদারুজ বললো—এসো না! এখানে তোমার বন্ধু ড্যাংলারও রয়েছে, ঐ দেখ।

এডমণ্ড বললো—না ভাই, আমার এখন অনেক কাজ।

কাদারুজ হেসে বললো—তাতো বটেই। আচ্ছা, ওদেরই তা'হলে এখানে ডাকছি।

এই ব'লেই সে ড্যাংলার আর ফার্নান্দ্‌কে ডাকলো সেখানে।

ড্যাংলার এসেই বললো—বিয়েটা কবে হচ্ছে এডমণ্ড?

—পরশু।

—এত তাড়াতাড়ি?

—হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়িই করতে হচ্ছে। বিয়ের পরেই আমাকে একবার প্যারিসে যেতে হবে কিনা!

—প্যারিসে?

—হ্যাঁ! আমাদের স্বর্গত ক্যাপ্টেন একটা জরুরি কাজের ভার দিয়ে গিয়েছেন আমার উপর। আমাকে একখানা চিঠি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে একজন লোকের কাছে! আচ্ছা ভাই, আমি এখন তাহ'লে আসি।

ড্যাংলার বললো—বিয়েতে নিমন্ত্রণ করছো তো আমাদের ?

যেতে যেতে এডমণ্ড বললো—নিশ্চয়ই।

এডমণ্ড চ'লে যেতেই ড্যাংলার মনে মনে বললে—কাপ্তেনের চিঠি নিয়ে প্যারিসে যাবে তুমি! ও চিঠি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী গুপ্তদলের। দাঁড়াও, এই অস্ত্রেই তোমাকে শেষ করছি আমি।

ফার্নান্দ্‌কে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ড্যাংলার হঠাৎ ব'লে উঠলো—আপনি মার্সেদেসকে বিয়ে করতে চান তো ?

ফার্নান্দ্‌ তখনও তাকিয়েছিল মার্সেদেস-এর চলার পথের দিকে। হতাশ স্বরে সে বললে—চাইলেই কি পাওয়া যায় বন্ধু ?

—যাতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা যদি আমি করতে পারি ?

ড্যাংলারের এই কথায় ফার্নান্দ্‌ আর কাদারুজ দু'জনেই তাকালো তার দিকে।

কাদারুজ বললো—কি ক'রে তা পারবে তুমি ?

ড্যাংলার বললো—এখানে দাঁড়িয়ে সে সব কথা আলোচনা করা ঠিক নয়। চলো একটা কেবিনে গিয়ে বসি।

তিন বন্ধুতে তখন রেস্তোরাঁর একটা কেবিনে গিয়ে বসলো।

কাদারুজ বললো—কি বলছিলে তুমি ?

ড্যাংলার বললো—তার আগে আমি জানতে চাই, এডমণ্ডের সঙ্গে মার্সেদেস-এর বিয়ে বন্ধ করতে পারলে তুমি খুশী হও কি না ?

কাদারুজ বললো—বিয়ে বন্ধ হ'লে যতটা খুশী হই আর না হই, ওর কাপ্তেনি পাওয়া যদি বন্ধ করতে পার তাহ'লে আমি সব চেয়ে বেশি খুশী হই।

—সে ব্যবস্থাও হবে! এক ঢিলেই দুই পাখী মারবার ব্যবস্থা আমি করেছি। ওর চাকরিও যাবে, বিয়েও হবে না।

ড্যাংলারের এই কথায় ফার্নান্দ্‌ সোজা হয়ে ব'সে বললো—পারবেন এরকম করতে ?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে গলাটা যে ভিজিয়ে নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে!

ফার্নান্দ্ বললো—নিশ্চয়ই, গলা না ভিজিয়ে নিলে কি কোন কাজ হয়? এই ব'লেই রেস্তোরাঁর একটা বয়কে ডেকে সে হুকুম করলো, পেগ লে আও!

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বোতল মদ, তিনটে গ্লাস আর কয়েক বোতল সোডা-ওয়াটার নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে গেল বয়।

মদ খেতে খেতে কথাবার্তা চললো ওদের মধ্যে।

কাদারুজ বললো—কেবলই তো ভনিতা ভাঁজছো, আসল কথাটা বলো দেখি, কি ক'রে ওর কাপ্তেনি পাওয়া বন্ধ করবে তুমি?

ড্যাংলার বললো—কি ক'রে করবো দেখতে চাও? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

এই ব'লেই একটা বয়কে ডেকে দোয়াত কলম আর একখানা কাগজ আনতে বললো সে।

কাদারুজ ঠাট্টার সুরে বললো—কাগজ কলম দিয়ে কি করবে হে? এডমণ্ডের গ্রেফ্তারী পরোয়ানায় সই করবে নাকি?

ড্যাংলার হেসে বললো—গ্রেফ্তারী পরোয়ানাই বটে!

একটু পরেই বয় কাগজ কলম আর একটা দোয়াত দিয়ে গেল। ড্যাংলার তখন কলমটি তার বাঁ হাতে নিয়ে কি যেন সব লিখে চললো। লেখা শেষ হয়ে গেলে বয়কে ডেকে দোয়াত কলম ফিরিয়ে দিয়ে বললো—শোনো কি লেখা হয়েছে। এই ব'লেই কাগজখানা পড়তে আরম্ভ করলো সে—

> সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানান হচ্ছে যে, ফারাওঁ জাহাজের দ্বিতীয় কর্মচারী এডমণ্ড দান্তে, এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত নেপোলিয়নের পক্ষ থেকে একখানা জরুরি ও গোপনীয় পত্র নিয়ে প্যারিসে রাজপক্ষের শত্রুদের কাছে বিলি করতে যাবে। এডমণ্ডের নিজের কাছে কিংবা তার বাড়িতে ঐ পত্র আছে।

পড়া হয়ে গেলে ড্যাংলার বললো—কি রকম মনে হচ্ছে তোমাদের?

ড্যাংলার বললো—বিয়েতে নিমন্ত্রণ করছো তো আমাদের ?

যেতে যেতে এডমণ্ড বললো—নিশ্চয়ই।

এডমণ্ড চ'লে যেতেই ড্যাংলার মনে মনে বললে—কাপ্তেনের চিঠি নিয়ে প্যারিসে যাবে তুমি ! ও চিঠি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী গুপ্তদলের। দাঁড়াও, এই অস্ত্রেই তোমাকে শেষ করছি আমি।

ফার্নান্দ্‌কে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ড্যাংলার হঠাৎ ব'লে উঠলো—আপনি মার্সেদেসকে বিয়ে করতে চান তো ?

ফার্নান্দ্‌ তখনও তাকিয়েছিল মার্সেদেস-এর চলার পথের দিকে। হতাশ স্বরে সে বললে—চাইলেই কি পাওয়া যায় বন্ধু ?

—যাতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা যদি আমি করতে পারি ?

ড্যাংলারের এই কথায় ফার্নান্দ্‌ আর কাদারুজ দু'জনেই তাকালো তার দিকে।

কাদারুজ বললো—কি ক'রে তা পারবে তুমি ?

ড্যাংলার বললো—এখানে দাঁড়িয়ে সে সব কথা আলোচনা করা ঠিক নয়। চলো একটা কেবিনে গিয়ে বসি।

তিন বন্ধুতে তখন রেস্তোরাঁর একটা কেবিনে গিয়ে বসলো।

কাদারুজ বললো—কি বলছিলে তুমি ?

ড্যাংলার বললো—তার আগে আমি জানতে চাই, এডমণ্ডের সঙ্গে মার্সেদেস-এর বিয়ে বন্ধ করতে পারলে তুমি খুশী হও কি না ?

কাদারুজ বললো—বিয়ে বন্ধ হ'লে যতটা খুশী হই আর না হই, ওর কাপ্তেনি পাওয়া যদি বন্ধ করতে পার তাহ'লে আমি সব চেয়ে বেশি খুশী হই।

—সে ব্যবস্থাও হবে ! এক ঢিলেই দুই পাখী মারবার ব্যবস্থা আমি করেছি। ওর চাকরিও যাবে, বিয়েও হবে না।

ড্যাংলারের এই কথায় ফার্নান্দ্‌ সোজা হয়ে ব'সে বললো—পারবেন এরকম করতে ?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে গলাটা যে ভিজিয়ে নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে!

ফার্নান্দ্ বললো—নিশ্চয়ই, গলা না ভিজিয়ে নিলে কি কোন কাজ হয়? এই ব'লেই রেস্তোরাঁর একটা বয়কে ডেকে সে হুকুম করলো, পেগ লে আও!

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বোতল মদ, তিনটে গ্লাস আর কয়েক বোতল সোডা-ওয়াটার নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে গেল বয়।

মদ খেতে খেতে কথাবার্তা চললো ওদের মধ্যে।

কাদারুজ বললো—কেবলই তো ভনিতা ভাঁজছো, আসল কথাটা বলো দেখি, কি ক'রে ওর কাপ্তেনি পাওয়া বন্ধ করবে তুমি?

ড্যাংলার বললো—কি ক'রে করবো দেখতে চাও? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

এই ব'লেই একটা বয়কে ডেকে দোয়াত কলম আর একখানা কাগজ আনতে বললো সে।

কাদারুজ ঠাট্টার সুরে বললো—কাগজ কলম দিয়ে কি করবে হে? এডমণ্ডের গ্রেফ্তারী পরোয়ানায় সই করবে নাকি?

ড্যাংলার হেসে বললো—গ্রেফ্তারী পরোয়ানাই বটে!

একটু পরেই বয় কাগজ কলম আর একটা দোয়াত দিয়ে গেল। ড্যাংলার তখন কলমটি তার বাঁ হাতে নিয়ে কি যেন সব লিখে চললো। লেখা শেষ হয়ে গেলে বয়কে ডেকে দোয়াত কলম ফিরিয়ে দিয়ে বললো—শোনো কি লেখা হয়েছে। এই ব'লেই কাগজখানা পড়তে আরম্ভ করলো সে—

> সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানান হচ্ছে যে, ফারাওঁ জাহাজের দ্বিতীয় কর্মচারী এডমণ্ড দান্তে, এল্বা দ্বীপে নির্বাসিত নেপোলিয়নের পক্ষ থেকে একখানা জরুরি ও গোপনীয় পত্র নিয়ে প্যারিসে রাজপক্ষের শত্রুদের কাছে বিলি করতে যাবে। এডমণ্ডের নিজের কাছে কিংবা তার বাড়িতে ঐ পত্র আছে।

পড়া হয়ে গেলে ড্যাংলার বললো—কি রকম মনে হচ্ছে তোমাদের?

এই চিঠি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালে ওর বিয়ে বন্ধ হবে কি না ?

ফার্নান্দ্ লাফিয়ে উঠে বললো—নিশ্চয়ই হবে! এই চিঠি কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজদ্রোহের অপরাধে ওকে গ্রেফ্তার করবে। চিঠিখানা আপনি আমাকে দিন মঁসিয়ে ড্যাংলার, আমি নিজের হাতে ওখানা ডাকে দেব।

এদিকে কাদারুজের তখন নেশায় বেতর্ অবস্থা। কিন্তু এই অবস্থাতেও সে হঠাৎ স্খলিত স্বরে ব'লে উঠলো—না—না, এ কখনও হ'তে পারে না। এডমণ্ড আমার বন্ধু। তার এরকম সর্বনাশ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।

ড্যাংলার হেসে উঠে বললো—আরে ছি ছি! তুমি কি সত্যি সত্যিই মনে করলে নাকি যে আমি এই রকম একটা কিছু করবো ? আমি এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম। এই দেখ, কাগজখানা আমি ফেলে দিচ্ছি।

এই কথা ব'লেই সে তার হাতের কাগজখানা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এর পর আবার চলতে লাগলো পানানন্দ। কাদারুজের অবস্থা আগেই বেসামাল হয়ে গিয়েছিলো, এখন একেবারে বে-এক্তার হয়ে পড়লো সে।

জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলতে গেল সে, কিন্তু তার কোন কথাই বোঝা গেল না। ড্যাংলার তখন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে বললো—চল কাদারুজ, তোমাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

কাদারুজকে ধ'রে বাইরে নিয়ে এসে একবার সে আড়চোখে ফার্নান্দের দিকে তাকালো। সে দেখতে পেলো যে, সেই দলা-পাকানো কাগজখানা তখন ফার্নান্দের হাতে। ওদের দু'জনের চোখে চোখে কি যেন কথা হ'লো।

কাদারুজের তখন ওদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবস্থা নয়।

চার

পরিচ্ছন্ন প্রভাত। সমুদ্রের নীলজলে ছড়িয়ে পড়েছে লীলায়িত সূর্যকরের রুপোলী আভা।

স্থানীয় গির্জায় আজ এডমণ্ডের সঙ্গে মার্সেদেস-এর বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। অতিথি-অভ্যাগতরা সবাই উপস্থিত।

এডমণ্ডের বাবার মুখে হাসি আর ধরে না—জীবনে বহু ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করবার পর অদৃষ্ট আজ তাঁর সুপ্রসন্ন হয়েছে। তাঁর একমাত্র বুকের দুলাল আজ বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনবে! তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে জাহাজের কাপ্তেনের উচ্চপদও লাভ করবে সে। ফারাওঁ জাহাজের মালিক মঁসিয়ে মোরেলও এসেছেন এই বিবাহ উৎসবে। কাদারুজ, ড্যাংলার, ফার্নান্দ্‌ ও ফারাওঁ জাহাজের নাবিকরাও এসেছে বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে।

কাদারুজের মনে আজ আর কোন রকম বিরোধী ভাব নেই। সেদিন রেস্তোরাঁয় ব'সে মদের ঝোঁকে এডমণ্ডের বিরুদ্ধে দু'চার কথা বললেও, আজ আর তার মনে কোন পাপ নেই। এডমণ্ডকে সে সত্যিই ভালবাসে।

কাদারুজ এ বিয়েতে খুশী হ'লেও ড্যাংলার আর ফার্নান্দ্‌ কিন্তু মোটেই খুশী নয়। তাদের দু'জনের বুকের মধ্যে যেন ঝড় বইছে। মনের উত্তেজনা চেপে রাখবার চেষ্টা করছে দু'জনেই। বিয়ের আর দেরী নেই। একটু পরেই ধর্মযাজক এসে পড়বেন। নিমন্ত্রিত নরনারী সবাই খুশী—আর সবচেয়ে খুশী আজ এডমণ্ড আর মার্সেদেস। বহুদিনের আশা আজ তাদের পূর্ণ হ'তে চলেছে! আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই···

হঠাৎ গির্জার দরজার বাইরে বুটের শব্দ শোনা গেল। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকালো দরজার দিকে। দরজা দিয়ে তখন ঢুকে পড়েছে একদল সৈন্য। সৈন্যদের সামনেই দেখতে পাওয়া গেল একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে।

ম্যাজিস্ট্রেট এসে গম্ভীর স্বরে বললেন—এখানে এডমণ্ড দান্তে নামে কেউ আছে কি?

এডমণ্ড এগিয়ে এসে বললো—নিশ্চয়ই আছে। আমারই নাম এডমণ্ড। কি দরকার আপনার বলুন ?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—রাজার আদেশে আপনাকে আমি গ্রেফ্‌তার করলাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের কথা শেষ হওয়ার আগেই দু'দিক থেকে দু'জন সৈনিক এসে এডমণ্ডের দু'খানা হাত ধ'রে ফেললো। এডমণ্ড আশ্চর্য হয়ে বললো—আমাকে গ্রেফ্‌তার করলেন! আমার অপরাধ ?

—অপরাধ কি তা যথাসময়েই জানতে পারবেন। আমার উপরে যে আদেশ হয়েছে, আমি শুধু তাই পালন করতে এসেছি।

—আপনাদের হয়ত কোথাও কোন ভুল হয়ে থাকবে। আমি তো আমার জ্ঞানত কোন অপরাধের কাজ করেছি ব'লে মনে হয় না।

—ভুল যদি হয়েই থাকে, তাহ'লে তা সংশোধন করতেও দেরী হবে না—আপনি আসুন।

ম্যাজিস্ট্রেট এডমণ্ডকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে মঁসিয়ে মোরেল তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললেন—আজ এডমণ্ডের বিয়ে, এ অবস্থায় তাকে আপনি নিয়ে যাবেন না। আমাকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন, আমি কথা দিচ্ছি, বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি নিজে সঙ্গে ক'রে এডমণ্ডকে পৌঁছে দিয়ে আসবো আপনার কাছে। এডমণ্ডের জন্যে আমি জামিন হচ্ছি।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—তা হয় না মঁসিয়ে মোরেল। এ আসামীকে জামিন দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

—কি এমন অপরাধ এডমণ্ড করেছে যে জামিন পর্যন্ত দেওয়া চলবে না ?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—রাজদ্রোহ।

—রাজদ্রোহ!

ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে 'রাজদ্রোহ' কথাটা শুনেই কাদারুজ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো ড্যাংলার আর ফার্নান্দের দিকে।

ম্যাজিস্ট্রেট ততক্ষণ এডমণ্ডকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করেছেন।

এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বধূ-বেশে সজ্জিতা মার্সেদেস—এডমণ্ড! ব'লে চীৎকার করে উঠেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝের উপর প'ড়ে গেল।

এডমণ্ডের বাবাও 'হা ভগবান!' ব'লে দুই হাতে মুখ ঢেকে ব'সে পড়লেন।

এদিকে কাদারুজ তখন ড্যাংলার আর ফার্নান্দ্‌কে টানতে টানতে একান্তে নিয়ে গিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললো—আমি বুঝতে পেরেছি, এসব তোমাদের দু'জনের কীর্তি!

ড্যাংলার যেন কিছুই জানে না এই রকম ভাব দেখিয়ে বললো—আমাদের দু'জনের কীর্তি! বলছো কি কাদারুজ?

—হ্যাঁ, তোমাদেরই কাজ এটা! তোমরা নিশ্চয়ই সেই চিঠিখানা পাঠিয়েছিলে কর্তৃপক্ষের কাছে।

—চিঠি! সে চিঠি তো আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম!

—না, ছিঁড়ে ফেলে দাওনি। সেখানা তুমি দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে।

—ও একই কথা।

—না, এক কথা নয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, তোমরা দু'জনে যুক্তি ক'রেই ঐ চিঠি ডাকে দিয়েছিলে। তোমাদেরই দোষে আজ দুটি নির্দোষ নর-নারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল।

এই ব'লে ফার্নান্দের দিকে তাকিয়ে সে আবার বললো—তুমি যে এতখানি নীচ, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ফার্নান্দ্‌! তুমি কি ভেবেছো যে এইভাবে এডমণ্ডকে ধরিয়ে দিলেই তুমি মার্সেদেসকে পাবে? ভুল ধারণা তোমার। মার্সেদেসকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি। এডমণ্ডের যত বিপদই হোক, তাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। আর ড্যাংলার! তুমি আজ যা করলে, তার কোন তুলনা হয় না! বন্ধুর ছদ্মবেশে ঘাতক তুমি! তোমার মুখ দেখতেও ঘৃণা হয়! যাই হোক, তোমরা ভেবো না যে, তোমাদের এই পাপ গোপন থাকবে! আমি এখনি যাচ্ছি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

তোমাদের সব কথা—সেই চিঠির কথা সবই আমি খুলে বলছি তাঁর কাছে।

কাদারুজ সত্যি সত্যিই চ'লে যায় দেখে ড্যাংলার বললো—তুমি কি পাগল হলে কাদারুজ? ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওসব কথা বললেই কি তিনি বিশ্বাস করবেন নাকি? প্রমাণ করতে পারবে তুমি যে ঐ চিঠি আমার হাতের লেখা? ও চিঠি আমি বাঁ হাতে লিখেছিলাম মনে আছে? লাভের মধ্যে এই সব কথা বলতে গিয়ে, নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়বে তুমি। ম্যাজিস্ট্রেট যখন জানতে পারবেন যে তুমি ঐ চিঠির কথা জানো, তখন তোমাকেও তিনি গ্রেফতার করবেন। এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারছ না তুমি?

ড্যাংলারের কথা শুনে কাদারুজের মুখখানা ভয়ে সাদা হয়ে গেল। সে আর কোন কথাই বলতে পারলো না।

পাঁচ

মঁসিয়ে ছ্য ভিলেফোর্ট তখন ওখানকার ডেপুটি প্রকিওরার *। সেদিন তিনি অফিসে আসতেই দেখলেন যে পুলিস কমিশনার তাঁর অপেক্ষায় ব'সে আছেন।

মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট বললেন—কী ব্যাপার! আজ যে বড় সকাল সকাল?

—হ্যাঁ, একটু সকাল ক'রেই আসতে হ'লো আজ। এডমণ্ড দান্তেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না!

—এডমণ্ড দান্তে! তিনি—টি আবার কে?

—ভুলে গেলেন নাকি এরই মধ্যে? সেই যে, যার বিরুদ্ধে একখানা বেনামী চিঠি এসেছিল গত পরশু দিন!

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। সেই গোপনীয় চিঠিখানা পাওয়া গেছে কি?

—তা ঠিক বলতে পারি না। ওকে তল্লাসী ক'রে যা যা পাওয়া গেছে, সবই আপনার টেবিলে রাখা হয়েছে।

—এখন তাহ'লে কি করতে চান?

—আসামীর জিজ্ঞাসাবাদটা আজই শেষ করা দরকার। ওর হয়ে একজন নামকরা লোক জামিন হ'তে চাইছেন।

—কে বলুন তো?

—মঁসিয়ে মোরেল।

—তাই নাকি! আচ্ছা আমি দেখছি। ভাল কথা! লোকটার বয়স কত?

—লোকটা কি বলছেন মঁসিয়ে, ওকে এখনও বালক বলা যায়। বয়স উনিশের বেশী হবে ব'লে মনে হয় না।

---

* পদটি আমাদের দেশের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটারের সমার্থব্যঞ্জক।

—বেশ, আপনি তাহ'লে ওকে পাঠিয়ে দিন এখানে। ওকেই আগে জিজ্ঞসাবাদ করা যাক।

পুলিস কমিশনার বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই এডমণ্ড ঢুকলো সেই ঘরে।

মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তার মুখের দিকে। কিন্তু সে মুখ দেখে বিস্মিত হ'লেন তিনি। কি সরল—কি সুন্দর! মঁসিয়ে ভিলেফোর্টের মনে হ'লো যে, এ রকম সরলতামাখা মুখ যার, সে কখনও অপরাধী হ'তে পারে না।

তাকে দেখে খুশীই হ'লেন মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম?

—এডমণ্ড দান্তে।

—কি কর তুমি?

—ফারাওঁ জাহাজের দ্বিতীয় কর্মচারী।

—হুঁ! কেন তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানো?

—আজ্ঞে না। ও সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি।

—কোথায় তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়?

—গির্জায়। আমার বিবাহসভায়। বিয়ের কিছুক্ষণ আগেই।

—তুমি কোন্ দলের লোক? রাজা অষ্টাদশ লুইর, না নেপোলিয়নের?

—আজ্ঞে, আমি রাজনীতির বা দলাদলির কোন ধারই ধারি না।

—তুমি এল্‌বা দ্বীপে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—আমার স্বর্গত কাপ্তেনের বিশেষ অনুরোধে। তাঁর অন্তিম-কালের সেই অনুরোধ আমি পালন না ক'রে পারিনি।

—কি সেই অনুরোধ?

—তিনি আমাকে একখানা প্যাকেট পৌঁছে দিতে বলেছিলেন মার্শাল বার্ট্রাণ্ডের হাতে।

—প্যাকেটের মধ্যে কি ছিল জান ?

—আজ্ঞে না। সে সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নেই।

—তোমার কোন শত্রু আছে ?

—না। অন্ততঃ আমি তা জানি না।

এডমণ্ডের কথাবার্তা শুনে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট বুঝতে পারলেন যে, সে নির্দোষ। তিনি বললেন—আমি তোমাকে মুক্তি দেব। বুঝতে পারছি তোমার কোন শত্রু তোমাকে বিপদে ফেলবার জন্য চক্রান্ত করেছে। কে তা আমি জানি না, কারণ চিঠিতে কোন নাম সই নেই। আচ্ছা দেখতো এই চিঠিখানা কার হাতের লেখা ব'লে মনে হয় তোমার !

এই ব'লেই ড্যাংলারের লেখা সেই চিঠিখানা বের ক'রে এডমণ্ডের হাতে দিলেন তিনি।

চিঠিখানা এডমণ্ডের পড়া হয়ে গেলে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট আবার জিজ্ঞাসা করলেন—এ চিঠি কার হাতের লেখা চিনতে পারো ?

এডমণ্ড চিঠিখানা আর একবার ভাল ক'রে দেখে বললো—না।

—এ চিঠিতে যা লেখা আছে তা কি সত্যি ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কি বললে ! সত্যিই তুমি একখানা চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলে প্যারিসে ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। একথা সত্যি !

—কে দিয়েছিল সেই চিঠি ?

—মার্শাল বার্ট্রাণ্ড।

—কোথায় সে চিঠি ?

—পুলিস আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

—তুমি আর কিছু জানো না ?

—না।

—তাহ'লে তোমার কোন ভয় নেই।

এডমণ্ড আনন্দিত হয়ে বললো—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি কি এখন বাড়ী ফিরে যেতে পারি ?

—আর একটু দাঁড়াও। প্যারিসে যার কাছে তুমি চিঠিখানা নিয়ে যাচ্ছিলে তার নামটা বলতে পার ?

—পারি। তাঁর নাম মঁসিয়ে নয়ের্তিয়ার, কক্-হিরন রোডে থাকেন তিনি।

এডমণ্ডের মুখে নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মঁসিয়ে ভিলেফোর্টের মুখখানা হঠাৎ যেন ক্যাকাসে হয়ে গেল।

তিনি বললেন—কি নাম বললে ? মঁসিয়ে নয়ের্তিয়ার ? তের নম্বর বাড়ীতে থাকেন ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনি চেনেন নাকি তাঁকে ?

মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট কঠিন স্বরে বললেন—না। রাজার বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদের কাউকেই আমি চিনি না।

এডমণ্ড সভয়ে বললো—ষড়যন্ত্র ! বলছেন কি স্যার ?

—হ্যাঁ, ষড়যন্ত্র ! নয়ের্তিয়ারের নাম-ঠিকানা তুমি কি ক'রে জানলে ?

—মার্শাল নিজে আমাকে ব'লে দিয়েছিলেন ঐ ভদ্রলোকের নাম আর ঠিকানা। নাম-ঠিকানা না জানলে চিঠি দেব কি ক'রে ?

—তা তো বটেই। আচ্ছা, এ চিঠি তুমি আর কাউকে দেখিয়েছ ?

—না !

—কাউকে বলেছ এ চিঠির কথা ?

—না !

—তুমি নিজে জান এ চিঠিতে কি লেখা আছে ?

—না।

মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট তখন দপ্তরের ভিতর থেকে চিঠিখানা বেছে বের ক'রে সীলমোহর ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, সর্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

এডমণ্ড ভয় পেয়ে ব'লে উঠলো—আপনি কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ?

অতি কষ্টে আত্মদমন ক'রে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট বললেন—তুমি সত্যি বলছো, এ চিঠিতে কি লেখা আছে তা তুমি জানো না ?

এডমণ্ড বললো—ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলছি, চিঠিতে কি লেখা আছে, সে কথা আমি কিছুই জানি না।

—বেশ। তাহ'লে জেনে রাখো, এই চিঠিই হচ্ছে তোমার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ।

—আজ্ঞে…

ভিলেফোর্ট তখন দেশলাই জ্বেলে চিঠিখানায় অগ্নিসংযোগ ক'রে বললেন—দেখ চিঠিখানা আমি তোমার সামনেই পুড়িয়ে ফেললাম এখন। তোমার বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণই রইল না।

এডমণ্ড অভিভূত স্বরে বললো—আপনি মহৎ!

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট বললেন—এখন আমার একটি কথা শোন।

—আদেশ করুন।

—আদেশ নয়, উপদেশ। আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে তোমাকে পুলিশের হেপাজতে থাকতে হবে। কিন্তু, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে এই চিঠির কথা কারো কাছেই প্রকাশ করো না।

—নিশ্চয়ই করবো না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট ঘণ্টা বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিস কর্মচারী এসে অভিবাদন জানালো। তিনি তার কানে কানে কি বললেন, সে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

এডমণ্ডের দিকে ফিরে তিনি বললেন—এখন তুমি এঁর সঙ্গে যাও। দু'চার দিনের মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

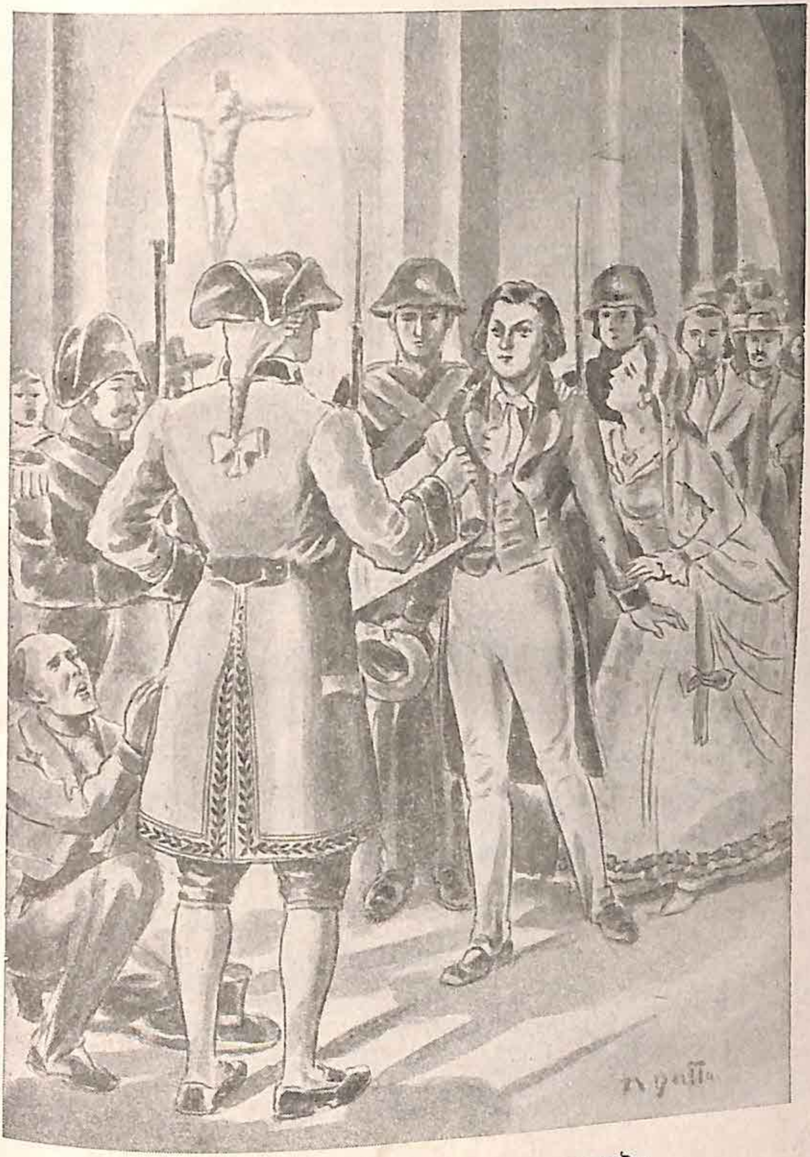
এডমণ্ডকে নিয়ে পুলিস অফিসার চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে একখানা চেয়ারের উপর ধপাস্ ক'রে ব'সে পড়লেন। তারপর নিজের মনেই ব'লে উঠলেন—ভাগ্যে প্রধান সরকারী অভিযোক্তা এখন ছুটিতে আছেন, এই চিঠি তাঁর হাতে পড়লে আমার সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! আমি ডেপুটি প্রকিওরার, আর আমারই বাবা করছেন কিনা নির্বাসিত নেপোলিয়নের হয়ে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত! এ কথা প্রকাশ হয়ে

পড়লে আমার চাকরি ত যেতোই, হয়তো কারাদণ্ড, বা তার চেয়েও কঠিন দণ্ড আমার হ'তো !

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর হঠাৎ তিনি উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—ঠিক হয়েছে ! এই চিঠি থেকেই আমি আমার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলব। চিঠি প'ড়ে জানা গেল, নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ ত্যাগ ক'রে আবার ফ্রান্সে ফিরে আসছেন ! খবরটা নিশ্চয়ই এখনো আমাদের রাজার কানে উঠেনি। এ খবরটা সর্বাগ্রে আমি গিয়ে যদি রাজাকে দিতে পারি, তাহ'লে আমার পদোন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। আজই আমি প্যারিসে রওনা হবো।

যথাসময়ে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট রাজার কাছে গিয়ে খবরটা দিয়েছিলেন, এবং তার পদোন্নতিও হয়েছিল। তিনি ছিলেন সরকারী অভিযোক্তার সহকারী, এবং ঐ খবর জানাবার পর হলেন প্রধান সরকারী অভিযোক্তা।

কিন্তু কোন্ নিরপরাধ হতভাগ্যের সারা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নৃশংসের মত বলি দিয়ে লাভ করলেন তিনি এই উচ্চপদ, সেটা আপনারা জানতে পারবেন, পরের পরিচ্ছেদেই।



দান্তে অগ্রসর হয়ে বললে ও নাম আমারই।

ছয়

নিকষকালো আঁধার-ঘেরা রাত্রি।

দুই দিকে দুইজন বন্দুকধারী সৈনিক এডমণ্ডের হাত ধ'রে একখানা ঘোড়ার গাড়ীর ভিতর টেনে তুললো। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো।

এডমণ্ড গাড়ীর জানালার দিকে তাকালো। প্রত্যেক জানালায় লোহার গরাদে। কয়েদীবাহী গাড়ী। এই গাড়ীতে উঠেও কিন্তু এডমণ্ডের মনে হ'লো যে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট তাকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন। মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট দয়ালু। তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন, আমাকে কেবল কয়েকদিনের জন্য পুলিসের হেপাজতে থাকতে হবে।

সমুদ্রের ধারে এসে গাড়ীখানা থামলো।

এডমণ্ড উঁকি মেরে দেখলো, সামনেই রয়েছে একদল সৈনিক। একজন সৈনিক বন্দুক কাঁধে ক'রে গাড়ীর সামনে এগিয়ে এসে বন্দীকে নামিয়ে আনতে বললো।

গাড়ী থেকে নামতে নামতে এডমণ্ড অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো —এত সৈন্য কেন এখানে?

সৈন্যেরা তাকে নিয়ে একটা জেটির ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে একখানা নৌকো বাঁধা ছিল। সেই নৌকোয় তোলা হ'লো এডমণ্ডকে। নৌকো ছেড়ে দিল। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এডমণ্ডের তপ্ত মাথা খানিকটা ঠাণ্ডা হ'লো। কৌতূহলী হয়ে একজন রক্ষীকে সে জিজ্ঞাসা করলো—আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—একটু পরেই দেখতে পাবে।

—তবু···

—উপরওয়ালার নিষেধ, তোমার সঙ্গে আমরা কথা কইতে পারবো না।

এরপর কিছুক্ষণ আর কারো মুখে কোন কথা নেই। নৌকো এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। একটা বাতি ঘর দেখা গেল। সেটাকে পিছনে রেখে নৌকো চলতে লাগলো।

আবার কৌতূহল জাগলো। এডমণ্ড আবার জিজ্ঞাসা করলো—এখনি যা জানতে পারব, তা একটু আগে আমাকে জানালে এমন কি ক্ষতি হবে? আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

এডমণ্ডের এই প্রশ্নের উত্তরে রক্ষীদের ভিতর থেকে একজন ব'লে উঠলো—শুনেছি তুমি নাবিক। মার্সেঈএ থাকো। এখনো কি তুমি বুঝতে পারছ না, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তোমাকে?

—না।

—সে কি! তুমি কি অন্ধ নাকি? ভালো ক'রে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি।

মিটমিটে তারকাকিরণে রহস্যময় নিশ্চন্দ্র আকাশ! খুব কাছেই অন্ধকারের মধ্যে সাগর-দানবের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটা পর্বত-দুর্গ। স্যাতো-দ্য-ইফ্। দুর্গটাকে এখন কারাগারে পরিবর্তিত করা হয়েছে। এডমণ্ড জানতো যে ঐ কারাগারে যাদের রাখা হয়, তারা আর জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। বহু হতভাগ্যের বন্দী-জীবনের অবসান ঘটেছে ঐ কুখ্যাত কারাগারে।

মনে মনে শিউরে উঠে এডমণ্ড বললো—স্যাতো-দ্য-ইফ্! ওখানে আমায় নিয়ে যাচ্ছো কেন? আমি তো কোন অপরাধ করিনি।

রক্ষীরা মুখ টিপে হাসলো।

—এখানে কি আমার বিচার হবে? এখানে কি কোন বিচারক আছেন?

—না। এখানে আছে শুধু কারাধ্যক্ষ, প্রহরী ও তোমার মত কয়েদীর দল—আর আছে খুব চওড়া পাথরের প্রাচীর।

—আমাকে কি এখানে বন্দী ক'রে রাখা হবে?

—তাই তো মনে হয়।

—সে কি কথা! আমাকে যে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট আশা দিলেন···

—কে তোমাকে কি আশা দিয়েছে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন নেমে পড় দেখি। নৌকো ঘাটে এসেছে!

অন্ধকারের ভিতর থেকে কয়েকটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো নৌকোর দিকে ! তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলো—বন্দী কোথায় ?

রক্ষীরা বললো—এই যে !

—ওকে নিয়ে এসো।

যন্ত্রচালিতের মত প্রহরীবেষ্টিত হয়ে এডমণ্ড চলতে লাগলো কারাগারের দিকে। কিছুক্ষণ চলবার পর সেই লোকটা বললো—দাঁড়াও !

এডমণ্ড সভয়ে লক্ষ্য করলো, তার সামনেই কারাগারের বিরাট লৌহকপাট।

সেই লোকটির আদেশে লৌহকপাট খুলে গেল। এডমণ্ডকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল সেই বিরাট কপাট। যেন একটা ভয়ংকর দানব গিলে ফেললো একটা ছোট্ট মানুষকে।

এডমণ্ডের মাথাটা ঘুরে উঠলো।

তার মনে পড়লো বৃদ্ধ পিতার কথা—মার্সেদেসের কথা—বাড়ীর কথা—মুক্ত আলো-হাওয়ার কথা।

ছ'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার ছই গাল বেয়ে।

হঠাৎ একজন কারারক্ষী কর্কশস্বরে বলে উঠলো—এই কয়েদী ! এগিয়ে আয় !

কয়েদী !

বিচার না হ'তেই কয়েদী হয়ে গেল সে ! হায় ভগবান !

সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

বন্দী আদেশ পালন করছে না দেখে কারারক্ষী তাকে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চললো ভিতর দিকে। কিছুক্ষণ চলবার পর একটা ঘরের সামনে এনে দাঁড় করানো হ'লো তাকে। কারারক্ষী তখন সেই ঘরের দরজা খুলে তাকে এক ধাক্কায় সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করতে করতে বললো—এই তোর ঘর। আজ চললাম। কাল আবার দেখা হবে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে কারারক্ষী এসে দরজা খুলে দেখে, কাল রাত্রে এডমণ্ড যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, এখনও ঠিক সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে। এক রাত্রেই তার চেহারা হয়েছে পাগলের মত, চোখ দুটি হয়েছে লাল টকটকে জবাফুলের মত।

রক্ষী তার কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে সহানুভূতির স্বরে বললো—রাত্রে ঘুমোওনি নাকি?

—জানি না।

—তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

—জানি না।

—তুমি কি চাও?

—গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে।

—অসম্ভব।

—কেন?

—তা নিষিদ্ধ।

—তবে কি নিষিদ্ধ নয়?

—খেতে পারো, শুতে পারো, ঘুমুতে পারো।

—আমি খেতে, শুতে, ঘুমোতে চাই না। অনাহারে মারা যেতে চাই।

—অবুঝ হয়ো না। অপেক্ষা কর। হয়তো গভর্নরের সঙ্গে একদিন তোমার দেখা হয়ে যেতে পারে।

—কতদিন পরে?

—হয়তো এক মাস, হয়তো ছয় মাস, হয়তো বা এক বৎসর।

—অতকাল অপেক্ষা করতে পারব না। আমি তাঁর সঙ্গে এখনই দেখা করতে চাই।

—বার বার এক কথা নিয়ে অত মাথা ঘামিও না। তাহ'লে হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

—পাগল হয়ে যাবো ?

—হ্যাঁ। এখানে ওরকম ব্যাপার এর আগেও হয়েছে। তুমি এখন যেখানে আছ, এই ঘরেই একটা লোক পাগল হয়ে গিয়েছিলো।

—পাগল হয়ে গিয়েছিলো ! বলছো কি ?

—ঠিকই বলছি। পাগল হবার পর লোকটার ধারণা হয়, সে নাকি অনেক টাকার মালিক। সে বলতো তাকে ছেড়ে দিলে গভর্নরকে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে।

—কতদিন আগে সে এখানে ছিলো ?

– তা প্রায় দুবছর হবে।

— এখন সে কোথায় ?

—মাটির নীচের অন্ধ-কোঠায়।

—কী ভয়ানক ! মাটির নীচের ঘরে মানুষ থাকতে পারে ?

—পারে কিনা নিজেই বুঝতে পারবে।

—তার মানে ?

—মানে, তোমাকেও শীগ্‌গিরই সেখানে চালান করা হবে। এডমণ্ড শিউরে উঠলো এই কথা শুনে।

* * * *

মাটির নীচের অন্ধ-কোঠা।

আলো নেই, হাওয়া নেই, কেবল আছে অন্ধকার। এই নীরন্ধ্র অন্ধকার আর ভয়াবহ নির্জনতাকে সঙ্গী ক'রে দিন কাটাচ্ছে এডমণ্ড।

দিনে একবার আর রাতে একবার রক্ষী এসে তার খাবার দিয়ে যায়! এডমণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখে তার আসা-যাওয়া। মুক্ত সে। ইচ্ছা করলে বাইরের মুক্ত বাতাসের স্পর্শ সে পেতে পারে—কিন্তু এডমণ্ড বন্দী, অসহায়। পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে তাকে জোর ক'রে বঞ্চিত করা হয়েছে—বিনা অপরাধে।

রক্ষীটির সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে এডমণ্ড। কিন্তু লোকটা যেন বোবা। কোন কথাই সে বলে না,—উত্তর দেয় না তার কোন প্রশ্নেরই।

এইভাবে কত দিন, কত মাস, কত বৎসর যে কেটে গেছে তা সে জানে না। কালের মাপকাঠি সে হারিয়ে ফেলেছে।

সে যখন জেলখানায় ঢুকেছিল তখন তার মুখে সবে মাত্র দাড়ি গজাতে আরম্ভ করেছে, আর এখন তার মুখে ছয় ইঞ্চি লম্বা দাড়ি। তার চুলও বেড়ে গিয়ে পিঠের নীচে পড়েছে।

প্রথম প্রথম সে বাইরে যাবার স্বপ্ন দেখতো, কিন্তু এখন আর তার মনে সে আশা নেই।

মানুষের সমাজ থেকে টেনে এনে অমানুষ ক'রে রাখা হয়েছে তাকে।

সাত

চুপ ক'রে শুয়েছিল এডমণ্ড। ঘুম তার চোখে ছিল না। তবুও সে চেষ্টা করলো ঘুমোতে। জেগে থাকলেই রাজ্যের চিন্তা এসে তার মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। ভূগর্ভের কত নীচে যে সে আছে তা সে জানে না। মাটির নীচের ভয়াবহ নীরবতা প্রথম প্রথম অসহনীয় মনে হ'লেও ক্রমে সহ্য হয়ে আসছে। বাইরের কোন শব্দই তার কানে আসে না। সেই অখণ্ড নির্জনতায় মাঝে মাঝে নিজের কণ্ঠস্বর শুনলেও সে চম্‌কে ওঠে। ঘরের মধ্যে চ'লে বেড়াবার সময় নিজের পায়ের শব্দও স্পষ্টভাবে শুনতে পায় সে।

হঠাৎ তার তন্দ্রা টুটে গেল। তার মনে হ'লো কোথায় যেন ঠুক্ ঠুক্ আওয়াজ হচ্ছে। অতি ক্ষীণ আওয়াজ। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সে। দেয়ালে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো শব্দটা।

ঠুক্—ঠুক্—ঠুক্ ঠুক্! কে যেন দেয়ালের গায়ে কোন শক্ত জিনিস দিয়ে আঘাত করছে। কিসের এ শব্দ? কোথা থেকে আসছে এই অদ্ভুত আওয়াজ?

এডমণ্ড বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ শব্দ যে কি তা সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারে না। খানিকক্ষণ পরে শব্দটা আবার থেমে গেল।

পরদিন আবার সেই শব্দ।

তার পরদিন, আবার তার পরদিনও!

এডমণ্ড লক্ষ্য করলো, রক্ষী যখন বন্দীদের খাবার নিয়ে আসে শব্দটা থেমে যায় তার কিছুক্ষণ আগেই। তারপর আবার আরম্ভ হয় সে চ'লে যাবার কিছুক্ষণ পরেই। এর অর্থ কি? এডমণ্ড আরও লক্ষ্য করে যে, শব্দটা যেন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে দিনের পর দিন। আশ্চর্য হয়ে সে ভাবে—এটা তাহ'লে ভৌতিক ব্যাপার নাকি?

সেদিনও রোজকার মত শুয়ে ছিল এডমণ্ড। মাথার ভিতর তখন তার অনেক চিন্তা।

মুক্তি কি পাব না কোনদিনই ? বাবা এখন কি করছেন ? তিনি কি বেঁচে আছেন এখনও ? মার্সেদেস কি অন্য কাউকে বিয়ে……

কিন্তু একি ! দেয়ালের পাথরখানা স'রে আসছে না ! তাইতো !

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে এডমণ্ড ! সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে, দেয়াল থেকে একখানা বড় পাথরের স্লাব আল্‌গা হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

এডমণ্ডের মনে হয় ওদিক থেকে কে যেন পাথরখানাকে ঠেলে দিচ্ছে। সে তখন লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে পাথরখানাকে ধ'রে টানতে লাগলো। কিছুক্ষণের চেষ্টায় পাথরখানা সম্পূর্ণভাবে ঘরের ভিতরে এসে পড়তেই এডমণ্ড অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো যে সেই পাথরের পিছনে একটা সুড়ঙ্গ-পথের মুখে এক অদ্ভুত মূর্তি।

মূর্তিটি হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। এডমণ্ড দেখলো যে লোকটার দাড়ি কোমরের নিচে পর্যন্ত নেমেছে, মাথায় সাদা চুলে জট্ পাকিয়ে গেছে। পরনে কয়েদীর পোশাক। সেই লোকটাই কথা বললো প্রথমে। হতাশ স্বরে সে বললো—হায় ভগবান ! আমার এতদিনের সব চেষ্টা আজ বিফল হয়ে গেল।

এডমণ্ড বললো—কে আপনি ? কি বিফল হয়ে গেল ?

লোকটা বললো—বিফল হলো আমার দীর্ঘ চার বছরের অমানুষিক চেষ্টা। আমি চেয়েছিলাম আমার ঘর থেকে সুড়ঙ্গ-পথ তৈরী ক'রে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেরুবো। কিন্তু আজ দেখছি দিক ভুল ক'রে উল্টো পথে সুড়ঙ্গ তৈরী করেছি আমি।

—আপনি কে দয়া ক'রে বলবেন কি ?

লোকটা হেসে বললো—তা জেনে তোমার কি সুবিধা হবে ? আমিও তোমারই মত একজন বন্দী। তবে এককালে লোকে আমাকে ফারিয়া বলে ডাকতো।

—ফারিয়া ! আপনিই সেই মহাজ্ঞানী অধ্যাপক ও ধর্মযাজক ফারিয়া ?

—হ্যাঁ বিগত জীবনে তাই ছিলাম বটে, তবে বর্তমানে আমি একটি

নম্বরে পরিণত হয়েছি। আমার নাম এখন 'তেইশ নম্বর'। অবশ্য আরও একটি নতুন উপাধি আমি পেয়েছি, সেটি হচ্ছে 'পাগলা'। যাইহোক আমার কথা পরে শুনলেও চলবে। এবার তোমার পরিচয়টা বল দেখি! নাম কি তোমার?

—আমার নাম এডমণ্ড দান্তে! আমি ফারাওঁ জাহাজের দ্বিতীয় কর্মচারী ছিলাম।

—তোমার বয়স কত?

—জানি না। কারাগারে বন্ধ থেকে আমি বৎসর আর কালের মাপ হারিয়ে ফেলেছি। কেবল এইটুকু মনে আছে, ১৮১৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন আমার বয়স ছিল উনিশ বৎসর।

ফারিয়া তখন মনে মনে কিছুক্ষণ হিসাব ক'রে বললেন—তাহ'লে তোমার বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর।

—বলেন কি! সাত বছর আমি এখানে আছি!

—হ্যাঁ তাই। যাই হোক, কি অপরাধে তুমি বন্দী হয়েছো?

—বিনা অপরাধে। শুনবেন আমার জীবনের কাহিনী?

ফারিয়া বললেন—শুনবো বৈকি, এসো তোমার বিছানায় ব'সে তোমার সব কথা শুনি।

* * * *

এডমণ্ডের মুখে তার বিড়ম্বিত জীবনের সব কথা শুনে ফারিয়া বললেন—তোমাদের কাপ্তেন যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এল্‌বা দ্বীপে যাবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করছিলেন, তখন সেখানে আর কোন লোক ছিল না?

—না, কামরার ভিতরে আমি আর কাপ্তেন ছাড়া আর কোন লোক ছিল না।

এই কথা ব'লে একটু চিন্তা ক'রে এডমণ্ড আবার বললো—তবে হ্যাঁ, ড্যাংলারকে কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম যেন।

—তাহ'লে জেনে রাখো, ঐ ড্যাংলারের চক্রান্তেই আজ তুমি এই কারাগারে।

—অসম্ভব! ড্যাংলার আমার বন্ধু।

—দুষ্ট লোকে বন্ধুত্ব মানে না। তোমার পদোন্নতি তার সহ্য হয়নি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস তার দলে ফার্নান্দ্ ও ছিল।

ফার্নান্দ্! সে কেন শত্রুতা করবে আমার সঙ্গে? আমি তো তার কোন অপকারই করিনি!

এডমণ্ডের এই কথায় ফারিয়া হেসে বললেন—তুমি দেখছি এখনও ছেলেমানুষ। এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারছ না যে মার্সেদেসকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে।

—এই তুচ্ছ কারণে আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তারা, এই কথা আপনি বলছেন?

—বলছি বৈকি! তা ছাড়া আরও একটা কথা জেনে রাখো যে মঁসিয়ে ভিলেফোর্টও তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

—না না, তিনি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আমার বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ সেই চিঠিখানা আমার সামনেই তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

ফারিয়া বললেন—হ্যাঁ, তা ফেলেছিল বটে, তবে সেটা তোমাকে বাঁচাবার জন্য নয়। নিজের বাবাকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই সেই চিঠিখানা সে পুড়িয়ে ফেলেছিল। তুমি হয়তো শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে মঁসিয়ে নয়ের্তিয়ার হচ্ছেন তোমার ঐ সজ্জন ভিলেফোর্টের বাবা।

—অ্যা! কি বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি। তাঁকে আমি খুব ভাল ভাবেই চিনি। তিনি যে সম্রাট নেপোলিয়ানের দলের লোক তাও আমি জানি। মার্শাল বার্ট্রাণ্ডের সেই চিঠিখানার কথা ফাঁশ হয়ে গেলে কেবল যে নয়ের্তিয়ারেরই বিপদ হ'তো, তাই নয়, ভিলেফোর্টকেও হারাতে হ'তো সরকারী চাকরির উচ্চাসন।

এডমণ্ড স্তম্ভিত হয়ে গেল এই কথা শুনে।

ফারিয়া তখন সস্নেহে তার মাথার উপর একখানি হাত রেখে বললেন—মানুষের হৃদয়হীনতা দেখে বিচলিত হ'য়ো না। আমিও তোমারই মত বিনা অপরাধে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছি। এক সময় লোকে আমাকে ভক্তি করতো, পণ্ডিত ব'লে শ্রদ্ধা করতো, কিন্তু মানুষের অমানুষিকতা আজ আমাকে ঠেলে দিয়েছে কারাগারের অন্ধকারে। পৃথিবীর আলো-হাওয়া আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে কয়েকজন স্বার্থপর জীবের—যারা মানুষ ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়, তাদের ষড়যন্ত্রে।

এই পর্যন্ত ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে ফারিয়া আবার বলতে আরম্ভ করলেন—কিন্তু তবুও আমি দুঃখ করি না। অভিযোগ জানাই না কারো কাছে। হয়তো এই শাস্তি আমার পাওনা ছিল। হয়তো এই অন্ধকার কারাকক্ষেই আমার সমাধি রচিত হবে। এই বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এই ব'লে একটু থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন—আমি চেয়েছিলাম এই কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে। দীর্ঘকাল—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে আমি সুড়ঙ্গ তৈরী ক'রে চলেছিলাম। আশা করেছিলাম, এই সুড়ঙ্গ-পথের শেষে দেখতে পাবো মুক্ত সমুদ্র। কিন্তু আমার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তোমার এই ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি ভুল পথে এসেছি। যাই হোক, ওসব কথা ভেবে আর লাভ কি? আমি আজ শত দুঃখ আর হতাশার মধ্যেও খুশী হয়েছি তোমাকে পেয়ে। তুমি আমার ছেলের বয়সী। আজ থেকে নিজের ছেলের মতই আমি তোমাকে দেখবো। বিদ্বান বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল। আমি গ্রীক, ইটালিয়ান, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী আর স্পেনীয় ভাষা জানি। সেই সব ভাষায় তোমাকে আমি শিক্ষিত ক'রে তুলবো।

এডমণ্ড বললো—কারাগারের অন্ধকারেই যার জীবন শেষ হবে, শিক্ষিত হয়ে তার লাভ?

—তুমি দেখছি একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছো ! হাল ছাড়তে নেই। তুমি যুবক। এখনও তোমার সামনে প'ড়ে আছে সুদীর্ঘ জীবন। হয়তো তুমি আবার অর্জন করবে অবাধ স্বাধীনতা ; আবার দেখতে পাবে মুক্ত আকাশের নীলিমা—অনুভব করবে অনাহত বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ।

এডমণ্ড নতজানু হয়ে ফারিয়ার পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বললো —আজ থেকে আমি আপনার আদেশমতই চলবো !

তারপর থেকেই শুরু হ'লো দুই বন্দীর অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা। দেখতে দেখতে নানা ভাষায়, নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলো এডমণ্ড —মহাজ্ঞানী অধ্যাপক ফারিয়ার অধ্যাপনার কল্যাণে।

সকাল থেকে দুপুরের খাবার আসবার আগে পর্যন্ত আর দুপুরের পর থেকে রাত্রের খাবার আসবার আগে পর্যন্ত সময়টা এডমণ্ড কাটাতো ফারিয়ার কক্ষে।

রক্ষীরা ওদের তৈরী সেই সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান জানতো না। এমন সুকৌশলে সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখতো ওরা, যার ফলে বাইরে থেকে কারো বুঝবার সাধ্য ছিল না যে, দেয়ালের গায়ে সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে।

আট

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন অধ্যাপক ফারিয়া। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরের আহার শেষ ক'রে এডমণ্ড তাঁর ঘরে এসেছিল। এই সময়টা ফারিয়া তাঁর চৌকির উপর ব'সে থাকতেন রোজই, কিন্তু সেদিন তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখে এডমণ্ড বিস্মিত হ'লো।

তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপনার কি কোন অসুখ করেছে?

ফারিয়া কোন উত্তর দিলেন না এডমণ্ডের প্রশ্নের। এডমণ্ড বুঝতে পারলো যে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সে তখন তাঁর শিয়রের কাছে ব'সে গায়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলো। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালো সে—ভগবান, এই মহাপ্রাণ মানুষটিকে তুমি ভাল করে দাও।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে চাইলেন ফারিয়া। তিনি উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ডান হাতখানা তুলতে চেষ্টা করলেন, তাও পারলেন না।

নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে এডমণ্ডের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—আজ থেকে আর আমি উঠে দাঁড়াতে পারবো না। পক্ষাঘাতে শরীরের ডান দিকটা অসাড় হয়ে গেছে আমার।

এই নিদারুণ সংবাদ শুনে এডমণ্ডের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

ফারিয়া বললেন—মনে দুঃখ করো না এডমণ্ড। আমার যে এরকম হবে তা আমি আগেই জানতাম। এর আগেও আর একবার এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম আমি। আমি এ-ও জানি যে, এই রোগেই আমার মৃত্যু হবে। এ রোগের তৃতীয়বার আক্রমণেই আমি মারা যাবো।

এডমণ্ড বললো—অমন কথা বলবেন না গুরুদেব! আপনাকে হারাতে হবে এ কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।

—কিন্তু সত্য যা তাকে তো অস্বীকার করা যায় না এডমণ্ড!

আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই যাবার আগে তোমাকে আমি কিছু দিয়ে যেতে চাই।

—ওসব কথা এখন থাক গুরুদেব। আপনি এখন ভয়ানক দুর্বল। এ অবস্থায় বেশী কথা বলা ঠিক নয় আপনার।

—না না এডমণ্ড, আমাকে তুমি বাধা দিও না। আজ না বললে হয়তো আর কোন দিন বলাই হবে না সে কথা। এতদিন যা আমি নিজের মনের মধ্যে গোপন ক'রে রেখেছি, সে কথা আজ আমি বলবো।

—কি কথা গুরুদেব ?

—তোমাকে আমি বিপুল গুপ্তধনের সন্ধান দেব।

—গুপ্তধন !

—হ্যাঁ, গুপ্তধন। যার পরিমাণ যে কোন রাজার ঐশ্বর্যের চাইতে বেশী। ঐ অতুল ঐশ্বর্যরাশির মালিক আমিই হতাম, কিন্তু তার আগেই আমার হ'লো যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ।

এডমণ্ডের মনে হ'লো, রোগের আক্রমণে হয়তো ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ফারিয়া তার মনের ভাব অনুমান ক'রে ম্লান হাসি হেসে বললেন —আমার কথায় সন্দেহ ক'রো না এডমণ্ড। মাথা আমার ঠিকই আছে। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথাগুলো।

এডমণ্ড বললো—বলুন !

ফারিয়া বলতে আরম্ভ করলেন—আমি যে কাউন্ট স্পাডার সেক্রেটারী ছিলাম সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এই স্পাডা বংশ এক সময় ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব'লে পরিচিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমের কুখ্যাত পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্দার আর দুরাত্মা সিজার বোর্জিয়া, কার্ডিনাল স্পাডাকে হত্যা ক'রে তাঁর অতুল ঐশ্বর্য হস্তগত করবার জন্য গোপনে এক ষড়যন্ত্র করে। তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে কার্ডিনাল স্পাডা তাঁর যাবতীয় ধনসম্পত্তি কোন এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে আসেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ঐ গুপ্তধনের সন্ধান তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকে জানাবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর তিনি পান না। দুরাত্মা সিজার বোর্জিয়া তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে হত্যা করে।

এডমণ্ড বললো—তারপর ?

—তারপর বোর্জিয়া স্পাডা-প্রাসাদ তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ করে। কিন্তু প্রাসাদে সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা আর কিছু আসবাবপত্র ছাড়া বিশেষ কিছু পায় না সে। তারপর থেকেই স্পাডা পরিবার "অতুল ধনশালী" এই প্রবাদ নিয়েই ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হয়ে পড়ে। এই পরিবারের সর্বশেষ উত্তরাধিকারীই ছিলেন কাউন্ট স্পাডা। কাউন্ট স্পাডার সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাঁর পৈতৃক প্রাসাদটি, কয়েকখানা প্রাচীন বই, কয়েক বাণ্ডিল দলিলপত্র আর রোমান ক্যাথলিক চার্চ সংক্রান্ত একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি। ঐ পুঁথিখানিকে স্পাডা পরিবার অতি পবিত্র ব'লে মনে করতেন। পূর্বপুরুষদের নির্দেশ ছিল যে ঐ পবিত্র পুঁথিখানি পরিবারের কর্তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উত্তরাধিকারীর হাতে দিয়ে যাবেন।

—আমি যাঁর সেক্রেটারী ছিলাম, তিনিও ঐ গ্রন্থখানি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রেই। স্পাডা পরিবারের ঐশ্বর্যের প্রবাদ তিনিও জানতেন, তাই আমাকে তিনি আদেশ করেছিলেন প্রাসাদের প্রত্যেকটি জায়গা খুঁজে দেখতে এবং প্রত্যেকখানা দলিল প'ড়ে দেখতে।

মাসের পর মাস আমি স্পাডা পরিবারের পুরানো দলিলগুলো প'ড়ে দেখতে থাকি। কিন্তু কোথাও ধনরত্ন সম্বন্ধে কোনরকম উল্লেখ পাই না। শুনেছিলাম যে, আমার আগে স্পাডা বংশের কুড়িজন পূর্ব-পুরুষ আর তাঁদের কুড়িজন সেক্রেটারী আমারই মত পণ্ডশ্রম ক'রে গেছেন।

এডমণ্ড বললো—তারপর ?

—তারপর আমার পূর্ববর্তীদের মত হতাশ হয়ে আমিও পুরানো কাগজ ঘাঁটার পণ্ডশ্রম বন্ধ করলাম। এর কিছুদিন পরেই কাউন্ট স্পাডা হঠাৎ মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তিনি আমার হাতে

স্পাডা পরিবারের শেষ সম্বল সেই জীর্ণ পুঁথিখানি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি, যা তখনও অবশিষ্ট ছিল, তুলে দিয়ে বললেন—আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মহিমান্বিত স্পাডা বংশ। তাই আমি আমাদের বংশের এই শেষ সম্পত্তি আপনার হাতেই তুলে দিয়ে গেলাম। আপনাকেই আমি ক'রে গেলাম আমার উত্তরাধিকারী। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কাউণ্ট স্পাডার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

এডমণ্ড বললো—তারপর ?

—কাউণ্টের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমি খবর পাই যে, আমাকে নাকি রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হবে। খবরটা পেয়ে আমার মনের অবস্থা যে খুব ভাল থাকতে পারে না, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারো। ঐ রকম মানসিক অবস্থায় এক রাত্রে কি মনে ক'রে আমি স্পাডা পরিবারের সেই পবিত্র পুঁথিখানি পড়তে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে হঠাৎ একখানা ভাঁজকরা কাগজ আমি দেখতে পাই তার মধ্যে। কাগজখানার ভাঁজ খুলে লক্ষ্য করলাম যে, তাতে কিছুই লেখা নেই। বাজে কাগজ মনে ক'রে আমি সেখানাকে মোমবাতির শিখের উপর ধরি পুড়িয়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে। আগুনের তাপ লাগতেই কাগজখানার উপর কতকগুলো অক্ষর ফুটে উঠে। আমি তখন তাড়াতাড়ি আগুন নিবিয়ে সেই লেখাগুলো পড়তে আরম্ভ করি। কিছুটা পড়েই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। ঐ কাগজখানাতেই লেখা ছিল স্পাডা বংশের সেই গুপ্তধনের সন্ধান।

এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা ব'লে হাঁফিয়ে উঠলেন ফারিয়া। এডমণ্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—একটু জল !

এডমণ্ড তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে রাখা জলের কলসী থেকে একটি গ্লাসে জল গড়িয়ে এনে ফারিয়ার মুখের কাছে ধরলো।

ফারিয়া এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের সবটুকু জল পান ক'রে ধীরে ধীরে বললেন—আমার বিছানার নিচে শিয়রের দিকে দুখানা ভাঁজকরা কাগজ আছে। কাগজ দুখানা বের ক'রে আনো তো !

এডমণ্ড কাগজ দুখানা বের ক'রে আনলে তিনি আবার বললেন—ওর মধ্যে সেই পোড়া কাগজখানা আর আমার হাতে লেখা একখানা নকল দেখতে পাবে তুমি। এইবার ঐ পোড়া কাগজখানা পড়ো, তাহলেই বুঝতে পারবে আমার কথা সত্যি কিনা।

এডমণ্ড তখন সেই পোড়া কাগজখানার ভাঁজ খুলে ফেললো।

কাগজখানার কিছুটা অংশ মাত্র পুড়ে গিয়েছিল। যে অংশটুকু আস্ত ছিল, তাতে লেখা ছিল—

"পরস্বাপহারী ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আমাদের বংশের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত দুই কোটি রোমান ক্রাউনের * চাইতেও বেশী মূল্যের ধনসম্পত্তি মণ্টিক্রিষ্টো দ্বীপে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

এই ধনরত্ন যাতে স্পাডা বংশের বৈধ উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্যের হাতে না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে তার সন্ধান আমি এই পুঁথির মধ্যে রেখে যাচ্ছি।

পশ্চিম সমুদ্রতীর ঘেঁষে যে পাহাড়টা দায়ের মত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পাহাড়ের নিচে দেখতে পাবে একটা ছোট পাহাড়ে' নদী। ঐ নদীর উৎস-বরাবর এগিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের ভিতরে। যাবার পথে পাহাড়ের চূড়াগুলো গুনতি ক'রে যাবে। কুড়ি নম্বর চূড়ার সামনে এসে একটু দক্ষিণ দিকে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে একটি গুহা। গুহার মুখটি পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছি। ঐ পাথরখানা সরিয়ে ফেলে গুহার মধ্যে ঢুকলেই পাওয়া যাবে সেই ধনরত্নের সন্ধান।"

কাগজখানা পড়া হয়ে গেলে এডমণ্ড বিস্মিত হয়ে ফারিয়ার দিকে তাকালো।

ফারিয়া বললেন—আজ থেকে এই কাগজ তোমার। তোমাকেই আমি দান করলাম স্পাডা বংশের ঐ বিপুল ধনরাশি।

এডমণ্ডের মাথা ঘুরতে লাগলো কাগজ দুখানা হাতে পেয়ে।

* দুই কোটি রোমান ক্রাউনের দাম স্টার্লিংএর হিসাবে তের কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি আর আমাদের দেশের টাকার হিসাবে একশ বিরাশি কোটি টাকার সমান।

নয়

এরপর থেকেই ফারিয়ার যাবতীয় ভার এসে পড়লো এডমণ্ডের উপরে। বৃদ্ধের ডান হাত আর ডান পা অবশ হয়ে যাওয়ায় এডমণ্ডই তাঁকে খাইয়ে দিতো রোজ এসে।

প্রহরী খাবার রেখে চলে যেতেই এডমণ্ড সেই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে ফারিয়ার ঘরে ঢুকতো। তারপর তাঁকে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরতো খাবার জন্য।

কিছুদিন এইভাবে কাটবার পর আবার সেই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন ফারিয়া। এবারকার আক্রমণ থেকে তিনি আর আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। এডমণ্ডের কোলে মাথা রেখে কারাগারের অন্ধকার গর্ভে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পৃথিবীর একজন মহাজ্ঞানী মানুষ।

বৃদ্ধের মৃত্যুতে এডমণ্ড ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলো। দুচোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল প'ড়ে বুক ভেসে যেতে লাগলো তার।

এদিকে তখন প্রহরীর খাবার নিয়ে আসবার সময় হয়ে গিয়েছিল। ওখানে ব'সে থাকলে ধরা পড়তে হবে, আর ধরা পড়লে সুড়ঙ্গের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে এই ভয়ে এডমণ্ড তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের মৃতদেহের উপরে কম্বল চাপা দিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ পরে।

এডমণ্ড নিজের বিছানায় আপাদমস্তক কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে বৃদ্ধের কথাই চিন্তা করছিল, এই সময় খাবার নিয়ে প্রহরী ঘরে ঢুকলো।

এডমণ্ডকে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে সে বললো—কি হে! ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি?

এডমণ্ড বললো—না। শরীরটা একটু খারাপ লাগছে, তাই একটু শুয়ে আছি।

—শরীর খারাপ লাগছে! তাহ'লে তুমিও আবার ঐ পাগ্‌লা বুড়োটার মত টেঁসে যাবে নাকি?

—কি বললে?

—ও, জানো না বুঝি? সেই যে পাগ্‌লা বুড়োটার কথা বলেছিলাম না! সেই বুড়োটা আজ মারা গেছে।

—কবর দেওয়া হয়েছে কি?

—কবর? হেসে উঠলো প্রহরী। বললো—এখানকার কোন কয়েদী মরলে আবার কবর দেওয়া হয় নাকি?

—কি করা হয় তাহ'লে?

—বস্তায় বন্ধ ক'রে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়। একেবারে যাকে বলে সলিল সমাধি—হেঁ-হেঁ-হেঁ।

—কখন ফেলা হবে?

—রাত্রে।

এডমণ্ড আর কোন কথা বললো না।

প্রহরী তখন তার খাবার নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে গেল।

সেদিন আর খেতে ইচ্ছা হ'লো না এডমণ্ডের। ফারিয়ার কথা মনে ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে,—আহা, এমন একজন জ্ঞানী মানুষকে কবর পর্যন্ত দেওয়া হবে না। বস্তায় বন্ধ ক'রে···

হঠাৎ তার মাথায় একটা মতলব এসে যায়।

—তাইতো! ওর বদলে আমি যদি বস্তার মধ্যে ঢুকে থাকি তাহ'লে কেমন হয়? ওরা আমাকে মরা মনে ক'রে সমুদ্রে ফেলে দেবে; তারপর আমি বস্তা কেটে বেরিয়ে পড়বো! ঠিক হয়েছে! এই উপায়েই আমি পালাতে চেষ্টা করবো!

উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে ওঠে। বিছানার উপরে উঠে বসে সে।

সন্ধ্যার পরে।

ফারিয়ার সেই কাগজ-দুখানাকে পকেটে নিয়ে এডমণ্ড সেই সুড়ঙ্গ-পথের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ কি মনে ক'রে একবার থমকে দাঁড়ালো সে! তারপর ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গের মুখের পাথরখানা সরিয়ে ফেলে সে ঢুকে পড়লো সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে।

ফারিয়ার ঘরে গিয়ে সে দেখতে পেলো যে ঘরের মধ্যে একটা বস্তা প'ড়ে আছে। বস্তাটার দিকে তাকাতেই তার মনটা হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো। কিন্তু এখন মন খারাপ ক'রে সময় নষ্ট করা চলে না। সে বস্তাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলো যে, ফারিয়ার মৃতদেহ তখন বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে বস্তার মুখটা সেলাই ক'রে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সেলাই করবার সুঁচ আর রসিও ছিল ওখানে। বোধ হয় প্রহরীরা ফেলে গেছে।

এডমণ্ড তখন আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না ক'রে বস্তার সেলাই খুলে মৃতদেহটা টেনে বের ক'রে ফেললো। তারপর সেই মৃতদেহকে টেনে নিয়ে চললো সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে। সুড়ঙ্গের সরু পথে মৃতদেহ নিয়ে চলতে খুবই কষ্ট হ'লো তার, কিন্তু কষ্টকে সে কষ্ট ব'লে মনে না ক'রে শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরে নিয়ে এলো। তারপর সেই মৃতদেহকে নিজের বিছানার উপর তুলে ভাল ক'রে কম্বল চাপা দিয়ে সে আবার ফিরে চললো ফারিয়ার ঘরে। বলা বাহুল্য, যাবার সময় সুড়ঙ্গ মুখের পাথরখানা ভাল ক'রে টেনে বন্ধ ক'রে দিল সে।

সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় ক'রে রেখেছিলেন ফারিয়া। ঐ সব জিনিসপত্রের মধ্যে কয়েকখানা চিনেমাটির প্লেটের ভাঙ্গা টুকরোও ছিল। এডমণ্ড ওগুলোর ভিতর থেকে ধারালো দেখে একখানা টুকরো তুলে নিয়ে পকেটে রাখলো। তারপর ঢুকে পড়লো ফারিয়ার ঘরে।

সে তখন তাড়াতাড়ি সেই বস্তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভিতর থেকেই অতি কষ্টে সেলাই ক'রে ফেললো বস্তার মুখটা।

প্রায় দুই ঘণ্টা বস্তাবন্দী হয়ে থাকবার পর দরজা খোলবার শব্দ

শুনতে পেলো এডমণ্ড। সে তখন মড়ার মত নিঃশব্দে প'ড়ে রইলো সেই বস্তার মধ্যে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যাতে কেউ শুনতে না পায় সেজন্য সে সাবধান হ'লো। তার বুকের মধ্যে তখন যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

একটু পরেই এডমণ্ড বুঝতে পারলো যে, প্রহরীরা দড়ি দিয়ে বস্তাটাকে বেঁধে ফেলছে। সে তখন মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগলো। তার মনে হ'লো যে ঐ বাঁধন কাটতে না পারলে তার জীবন্ত সমাধি হবে সমুদ্রের অতল তলে।

বাঁধাছাঁদা শেষ হয়ে গেলে তাকে ধ'রে তুললো তিন চার জনে মিলে। একজন আবার রসিকতা করে বললো—বুড়োটা কি ভারী দেখছো ?

কিছুক্ষণ পরেই শীতল বাতাসের স্পর্শে শরীর জুড়িয়ে গেল এডমণ্ডের। বুঝতে দেরী হ'লো না যে তাকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। বাইরে এসে প্রহরীরা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলো তাকে কাঁধে নিয়ে। অনেকটা পথ চলবার পর হঠাৎ নামিয়ে রাখা হ'লো তাকে। এর কিছুক্ষণ পরেই এডমণ্ডের মনে হ'লো তার পায়ের সঙ্গে কি যেন বাঁধা হচ্ছে। আসলে সেটা ছিল একগাছা সরু লম্বা দড়ি। সেই দড়ির আর এক প্রান্তে বাঁধা ছিল একখানা ভারী পাথর। মৃতদেহ যাতে ভেসে উঠতে না পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

যে জায়গাটায় তাকে রাখা হয়েছিল সেটা ছিল একটা পাহাড়ের চূড়া। তার ঠিক নীচেই সমুদ্র। প্রহরীরা তখন তিন চার জন ধ'রে তার বস্তাবন্দী দেহটাকে তুলে নিয়ে বার কয়েক দোল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেই দড়িতে বাঁধা পাথরখানাও ঠেলে ফেলে দিল।

ঝপাং ক'রে একটা শব্দ তুলে এডমণ্ডের বস্তাবন্দী দেহটা তলিয়ে যেতে লাগলো। পায়ের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা পাথরের টানে নীচে

নেমে যেতে লাগলো সে। জলের চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও মনের বল হারালো না এডমণ্ড। সে তাড়াতাড়ি সেই ভাঙ্গা প্লেটের টুকরোটা দিয়ে বস্তার সেলাইটা কেটে ফেললো। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সে কাটতে লাগলো পায়ে বাঁধা সেই দড়িগাছা।

মুহূর্তে মুহূর্তে নীচের দিকে নেমে চলেছে সে। দম আর থাকছে না। এখনই হয়তো দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে সে। সে তখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়িগাছা কাটতে চেষ্টা করতে লাগলো। হঠাৎ দড়িগাছা কেটে গেল এই সময়। দড়ি কেটে যেতেই সে ভেসে উঠতে লাগলো উপরের দিকে। সে তখন বহু কষ্টে বস্তার বাঁধনগুলো কেটে ফেলে বস্তা থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভেসে উঠলো জলের উপর।

মুক্তি! ওঃ! কত কাল পরে বাইরের মুক্ত হাওয়া গায়ে লাগলো এডমণ্ডের।

উপরের দিকে তাকিয়ে এডমণ্ড দেখতে পেলো যে প্রহরীরা তখনও যায়নি ওখান থেকে। তাদের লণ্ঠনের আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়ার উপর।

এডমণ্ড সাঁতার কেটে এগিয়ে চললো।

কিছুক্ষণ সাঁতার কাটবার পর হঠাৎ বিকট ঢং ঢং আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো সে। জেলখানায় 'পাগলা ঘন্টি' বেজে উঠেছে।

দশ

মুক্তির আশায় প্রাণপণে সাঁতার দিয়ে এগোচ্ছিলো এডমণ্ড, কিন্তু মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হয়! তীরের দিকে যাবার উপায় নেই। তীরে উঠলেই আবার তাকে ধরা পড়তে হবে। তার তখন একমাত্র ভরসা, কোন জাহাজ যদি তাকে দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। কিন্তু অন্ধকার সমুদ্রে কোন জাহাজের চিহ্নও সে দেখতে পেলো না। ক্রমে পূবের দিক ফর্সা হয়ে এলো। সারারাত সাঁতার কাটার ফলে হাত-পা অবশ হয়ে আসতে লাগলো এডমণ্ডের। দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের বুকে খালি হাতে কতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে মানুষ! মাথা ঘুরে উঠলো এডমণ্ডের।

তারপর আর সে কিছু মনে করতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে ভেসে চললো সে সাগরের বুকে।

* * *

ভূমধ্যসাগরে সেই সময় বহু বোম্বেটে-জাহাজ চলাফেরা করতো। এই জাহাজের নাবিকদের চেহারা ভদ্রলোকের মত হ'লেও আসলে তাদের পেশা ছিল ডাকাতি করা।

এডমণ্ডের সংজ্ঞাহীন দেহটি যখন সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে চলেছে, সেই সময় ঐ রকম একখানি জাহাজ চলেছিল তার পাশ দিয়ে। জাহাজের একজন নাবিক হঠাৎ দেখতে পায় যে জলের উপর একটি মানুষের দেহ ভেসে যাচ্ছে। সে তক্ষুনি খবরটা জানালো জাহাজের কাপ্তেনকে।

কাপ্তেন বললো—তুলে নাও ওকে।

জাহাজে তুলবার পর এডমণ্ডের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল সবাই। একি সাংঘাতিক চেহারা রে বাবা! দেড় হাত লম্বা দাড়ি, মাথার চুল আড়াই হাত লম্বা, হাতের নখগুলো তিন চার ইঞ্চি ক'রে! মানুষের এ রকম চেহারা আগে দেখেনি তারা।

কাপ্তেন বললো—এটা কোন্ দেশের লোক বলতে পারো?

নাবিকরা সমস্বরে বললো—না, এ রকম মানুষ জীবনে দেখিনি আমরা।

একজন বললো—এটা কোনো জন্তু নয় তো ?

আর একজন বললো—দূর ! জন্তু হবে কেন ? দেখছো না, ঠিক মানুষের মত চেহারা !

আর একজন এই সময়ে ব'লে উঠলো—আরে আরে ! এর গায়ে যে কয়েদীর পোশাক দেখছি। বোধ হয় জেল থেকে পালিয়েছে লোকটা।

কাপ্তেন বললো—তাই হবে। আচ্ছা দেখতো লোকটা বেঁচে আছে কি না ?

কাপ্তেনের আদেশে একজন লোক এডমণ্ডের বুকের উপরের দাড়ির গোছা সরিয়ে দিয়ে তার বুকের উপরে কান রাখলো। কিছুক্ষণ কান লাগিয়ে থেকে সে বলে উঠলো—না, মরেনি ! বুক ধক্ ধক্ করছে এখনও।

কাপ্তেন বললো,—আচ্ছা, এবার তাহ'লে ওর পেট থেকে জলগুলো বের করবার ব্যবস্থা করো।

সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জন লোক মিলে এডমণ্ডের দেহটিকে উপুড় ক'রে শুইয়ে তার হাত আর পা ধ'রে নানা রকম প্রক্রিয়া শুরু করলো। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে প্রক্রিয়া করবার পর এডমণ্ডের পেট থেকে জল বের হয়ে গেল। কাপ্তেন তখন তাকে শুকনো পোশাক পরিয়ে গরম কাপড় দিয়ে সেঁকতে আদেশ দিলো। কিছুক্ষণ সেঁকবার পর চোখ মেলে চাইলো এডমণ্ড।

সে চোখ মেলে তাকাতেই খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দেওয়া হ'লো তাকে।

ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়তেই তার শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। সে ধীরে ধীরে বললো—আমি কোথায় ?

কাপ্তেন বললো—আমার জাহাজে।

—কোন্ দেশের জাহাজ এটা ?

—ভয় নেই, আমরা তোমাকে ধরিয়ে দেব না! কিন্তু তুমি জেল থেকে পালালে কি ক'রে?

—সে অনেক কথা। এখন বলতে পারবো না। একটু সুস্থ হ'লে সব কথাই বলবো আপনাকে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমাকে ওদের হাতে ধরিয়ে দেবেন না যেন।

কাপ্তেন মৃদু হেসে বললো—না, সে ভয় নেই তোমার। তা-ছাড়া আমরাও খুব সাধু-সজ্জন নই। বোম্বেটে-জাহাজের নাম শুনেছ তো? এখানাও একখানা বোম্বেটে-জাহাজ।

এডমণ্ড খুশী হ'লো এই কথা শুনে। খুশী হ'লো এই কারণে যে, বোম্বেটেরা তাকে নিশ্চয়ই ধরিয়ে দেবে না।

সে তখন উঠে বসবার চেষ্টা করতেই কাপ্তেন বললো—এখনই উঠে বসবার চেষ্টা ক'রো না। আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপরে উঠো।

কাপ্তেনের নির্দেশে তখনই এক প্লেট ডিম আর আলুসিদ্ধ এনে দেওয়া হ'লো তাকে।

দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে ডিমসিদ্ধ মুখে দিল সে। কি ভালই যে লাগলো তার ঐ ডিম আর আলুসিদ্ধগুলি!

তাকে গোগ্রাসে গিলতে দেখে কাপ্তেন বললো—আর দেব?

এডমণ্ড বললো—দিন।

কাপ্তেনের আদেশে আর এক প্লেট ডিমসিদ্ধ এনে দেওয়া হ'লো তাকে।

খাওয়ার পরে এডমণ্ড বললো—আপনাদের জাহাজে কোন নাপিত আছে কি?

কাপ্তেন হেসে বললো—তা তো আছে, কিন্তু আমি ভাবছি তোমার এই জাঁদরেল চেহারাখানার একটা ছবি যদি রাখা যেতো তাহ'লে বড় চমৎকার হ'তো। এ রকম দেড় হাত লম্বা দাড়িওয়ালা মানুষ তো বড় একটা দেখা যায় না কি না!

হবব জবব দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে এডমণ্ড হেসে ফেললো এই

কথা শুনে। হাসি থামলে সে বললো—আমার এই চেহারাখানা নিজেরই একবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে যে!

কাপ্তেন বললো—বেশ তো! আমার ক্ষুর নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাও। ওখানে আয়না আছে। কামানোও হবে, চেহারাও দেখতে পাবে।

এই ব'লেই একজন লোককে সে আদেশ করলো—আমার ঘর থেকে কামাবার সরঞ্জামগুলো এনে দাও তো একে।

একটু বাদেই একখানা ক্ষুর আর একখানা কাঁচি নিয়ে এসে লোকটা বললো—এসো আমার সঙ্গে, বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখেই ঘাবড়ে গেল এডমণ্ড। একি সাংঘাতিক চেহারা রে বাবা!

এর পর কিছুক্ষণ আয়নায় সেই অপরূপ চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষুর দিয়ে দাড়ির গোছা চেঁছে ফেলে দিল সে।

দাড়ি গোঁফ কামানো হয়ে গেলে এডমণ্ড আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো যে, তখনও তার চেহারায় যৌবনের দীপ্তি আছে।

এডমণ্ড হিসাব ক'রে দেখলো, তার বয়স তখন তেত্রিশ বছর।

দাড়ি গোঁফ কামানো হয়ে গেলে সে কাঁচি দিয়ে মাথার চুলগুলোও ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে ফেললো। এইভাবে চুল দাড়ি কামানো হয়ে গেলে সে স্নান করতে বসলো। অনেকক্ষণ ধ'রে স্নান ক'রে গা থেকে ময়লাগুলো যতদূর সম্ভব ঘসে তুলে সে পোশাক প'রে নিলো। পোশাক প'রে আবার সে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। নাঃ! ভালই দেখাচ্ছে তাকে।

এই সময় হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল যে হাত পায়ের নখগুলো কাটা হয়নি। সে তখন কাঁচি দিয়ে হাত পায়ের নখগুলো কেটে ফেললো।

এর পর সে যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো তখন তাকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। জাহাজের কাপ্তেন তার দিকে এগিয়ে

এসে করমর্দন ক'রে বললো—বাঃ! তোমার চেহারাখানা তো বড় চমৎকার হে!

এই সময় হঠাৎ ফারিয়ার সেই কাগজ ছুখানার কথা মনে প'ড়ে যায় এডমণ্ডের। কাগজ ছুখানা তার সেই কয়েদী-জামার পকেটে ছিল।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো সে—আমার জামা! আমার জামা কোথায় রেখেছেন?

নাবিকদের মধ্যে একজন হেসে বললো—তোমার সেই মহামূল্যবান জামাটার কথা বলছো তো? ভয় নেই, ও চীজ চুরি যাবে না। ঐ দেখ দড়িতে শুকোচ্ছে।

এডমণ্ড ছুটে গেল সেই জামাটার কাছে! তারপর তার পকেটে হাত দিয়ে টেনে বের করলো সেই ভাঁজ-করা কাগজ ছুখানা। বের করবার সময় সে নাবিকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, উদ্দেশ্য—ওরা কেউ যাতে দেখতে না পায় জিনিসটা।

ভিজে একেবারে ন্যাতা হয়ে গিয়েছিল কাগজ ছুখানা। এডমণ্ড তাড়াতাড়ি কাগজ ছুখানাকে পকেটে ফেলে জামাটাকে উল্টে দিতে লাগলো। এমন ভাব দেখালো যেন ঐ জামাটা শুকোতে দিতেই সে ওখানে গেছে।

সে ফিরে এলে কাপ্তেন বললো—ও জামাটির মায়া এবার তোমাকে ত্যাগ করতে হবে ভাই। ও চীজ তোমার কাছে দেখলেই পুলিস তোমাকে ধরবে।

এডমণ্ড বললো—ঠিকই বলেছেন। ওটাকে এখনই বিদেয় করা উচিত।

এই ব'লেই সে আবার এগিয়ে গেল সেই জামাটার কাছে। তারপর দড়ি থেকে জামাটা নামিয়ে নিয়ে ডেকের ধারে গিয়ে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটাকে।

এগার

ভূমধ্যসাগরের বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে বোম্বেটেদের "এমেলিয়া" জাহাজখানা। এডমণ্ড ইতিমধ্যেই ভিড়ে গেছে তাদের দলে। তার জাহাজী-জ্ঞান ও জাহাজ চালাবার অভিজ্ঞতা দেখে বোম্বেটেরা খুশী হয়েছিল।

ওরা চলেছিল ফ্রান্সের সীমান্তে—জাহাজের বে-আইনী মালগুলো কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিতে। কয়েকদিন চলবার পর এডমণ্ড একদিন দেখতে পেলো যে জাহাজখানা একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ওটা কোন্ দ্বীপ বুঝতে না পেরে জাহাজের কাপ্তেনকে সে জিজ্ঞাসা করলো—ওটা কোন্ দ্বীপ কাপ্তেন ?

—মন্টিক্রিষ্টো দ্বীপ।

—মন্টিক্রিষ্টো দ্বীপ !

কাপ্তেনের মুখে এই কথা শুনেই এডমণ্ডের বুকের ভিতর হঠাৎ যেন আলোড়ন আরম্ভ হয়ে গেল।

অতিকষ্টে মনের ভাব চেপে রেখে সে বললো—চলুন না, ওখানে কয়েকঘণ্টা বিশ্রাম করে যাই !

কাপ্তেন হেসে বললো—খুব জায়গায় বিশ্রাম নেবার কথা বলেছো ভায়া ! ওখানে কি মানুষ আছে নাকি ?

—তার মানে ?

—মানে, ঐ দ্বীপে আজ পর্যন্ত মানুষের বসতি হয়নি। তবে হ্যাঁ, শিকার যদি করতে চাও তাহ'লে যেতে পারি। প্রচুর শিকার পাওয়া যায় ওখানে।

জ্যাকোপো নামে ওদের মধ্যেকার একজন বোম্বেটে ব'লে উঠলো এইসময়—কথাটা মন্দ বলেননি। অনেকদিন মাংস খাওয়া হয়নি ; চলুন দ্বীপে নেমে কিছু শিকার ক'রে নেওয়া যাক।

কাপ্তেন বাধা দিলো না এই সাধু প্রস্তাবে।

জাহাজের গতি পরিবর্তিত হ'লো মন্টিক্রিষ্টো দ্বীপের দিকে।

তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে নোঙর ফেলা হ'লো। জল কম ব'লে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বোম্বেটেরা তখন একখানা বোটে ক'রে চলতে লাগলো তীরের দিকে। বোটে উঠবার আগে তারা প্রয়োজনীয় গুলি, বারুদ, বন্দুক, কুড়ুল, কাটারি, রান্না করবার বাসনপত্র আর মসলাপাতি তুলে নিলো বোটে। বলা বাহুল্য, এডমণ্ডও চললো তাদের সঙ্গে।

তারপর তীরে নেমে কথা হ'তে লাগলো, কে শিকার করতে যাবে।

এডমণ্ড বললো—আমি যাব।

জ্যাকোপো বললো—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

এডমণ্ডের ইচ্ছা ছিল, সে একাই যাবে, তাই জ্যাকোপো যেতে চাওয়ায় সে একটু বিরক্তই হ'লো মনে মনে। কিন্তু মনের বিরক্তি মুখে প্রকাশ না ক'রে সে যেন খুব খুশী হয়েছে এই রকম ভাব দেখিয়ে জ্যাকোপোর সঙ্গে এগিয়ে চললো!

কিছুদূর যাবার পর একটা নধর পাঁঠা দেখতে পেয়ে এডমণ্ড গুলি ক'রে মেরে ফেললো সেটাকে। জ্যাকোপো মনের আনন্দে ছুটে গিয়ে পাঁঠাটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে বললো—চলো ভাই, আর শিকারে দরকার হবে না।

এডমণ্ড বললো—না ভাই, তুমি বরং এটাকে নিয়ে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করো। আমি দেখি আরও দু একটা পাই কি না। খাওয়ার আগে আমি যদি না এসে পৌছাই তাহ'লে একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রো। বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই আমি চ'লে আসবো।

জ্যাকোপোর তখন জিভ দিয়ে জল পড়ছে। কতক্ষণে পাঁঠাটাকে রোষ্ট করা হবে, তার মনে তখন কেবল সেই চিন্তা। সে তাই আনন্দের সঙ্গেই রাজী হ'লো এডমণ্ডের প্রস্তাবে।

জ্যাকোপো চ'লে যেতেই এডমণ্ড চললো পূবের দিকে। পূবের

ঐ পাহাড়টার উপরে যেতেই হবে তাকে। পাহাড়ের কাছে হাজির হয়ে এডমণ্ড লক্ষ্য করলো যে, একটা শুকনো খাল এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে সমুদ্রের দিকে। খালটি দেখে এডমণ্ডের মনে হ'লো যে এক সময় হয়তো ওটা নদী ছিল। মহাকালের হস্তক্ষেপে আজ শুকিয়ে গেছে। নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলতে লাগলো সে।

অনেকক্ষণ চলবার পর পাহাড়ের নীচে এসে গেল এডমণ্ড। এইবার শুরু হ'লো চড়াই। কোথাও খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে, গাছের ডাল লতা গুল্ম ধ'রে, কোথাও বা হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো সে। চড়াই শেষ হ'তেই আরম্ভ হ'লো উৎরাই। এইভাবে বহু চড়াই উৎরাই ভেঙে পাহাড়ের চূড়াগুলি গুনতে গুনতে চলেছে সে। তার লক্ষ্য কুড়ি নম্বর চূড়ার দক্ষিণ দিকের সেই গুহাটি—যার মধ্যে সঞ্চিত আছে স্পাডা পরিবারের অতুল ঐশ্বর্যরাশি।

কিন্তু এখনও যে দশটি চূড়াও পার হয়নি সে! এইভাবে চললে কুড়ি নম্বর চূড়ায় পৌঁছাতে বেলা শেষ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই! ওদিকে তার দেরী দেখে তার সঙ্গীরা হয়তো খুঁজতে আসবে তাকে! তারা যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে তার উদ্দেশ্যের কথা তাহ'লে সব পণ্ড হবে।

এইসব কথা চিন্তা ক'রে এডমণ্ড ফিরে আসাই ঠিক করলো তখনকার মত। সে ভাবলো সঙ্গীদের কোন রকমে এখান থেকে বিদায় করতে পারলে হয়।

যাবার সময় সে পথের দুই দিকে চিহ্ন রাখতে রাখতে চললো। কোথাও পাহাড়ের গায়ে দাগ কেটে, কোথাও গাছের ডাল কেটে পথে রেখে নিশানা ঠিক ক'রে রাখতে লাগলো সে।

অনেকক্ষণ চলবার পর সমুদ্রের দিকের প্রথম চূড়াটার উপর উঠে সে দেখতে পেলো তার সঙ্গীদের। তারা তখন খাবার ব্যবস্থায় উন্মত্তপ্রায়। হঠাৎ জ্যাকোপো তার বন্দুকটা আকাশের পানে তুলে ধ'রে একটা আওয়াজ করলো। এডমণ্ড বুঝতে পারলো, খাবার তৈরী হয়ে গেছে, তারই সংকেত করলো জ্যাকোপো। এডমণ্ড

পাহাড়ের উপর থেকে হাত তুলে ইসারায় উত্তর দিল—সে আসছে।

জ্যাকোপো দেখতে পেলো তাকে। সেও হাত তুলে ইসারা করলো।

এডমণ্ড তখন লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগলো সেই চূড়া বেয়ে।

হঠাৎ তার সঙ্গীরা দেখলো যে এডমণ্ড প'ড়ে গেল। হয়তো পা পিছলে প'ড়ে গেছে, হয়তো খুবই আঘাত পেয়েছে সে—এই ভেবে চার জন লোক ছুটে আসতে লাগলো সেই পাহাড়ের দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই এডমণ্ডকে দেখতে পেলো তারা। পাহাড়ের উপরে একটা গর্তের মধ্যে প'ড়ে ছিল সে।

ওরা তখন এডমণ্ডের কাছে গিয়ে তাকে ধ'রে তুলবার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো সে।

জ্যাকোপো বললো—খুব লেগেছে বুঝি?

যন্ত্রণা-কাতর-কণ্ঠে এডমণ্ড বললো—হ্যাঁ!

—যেতে পারবে না?

—না। আমার পাঁজরার হাড় বোধ হয় ভেঙে গেছে। আমাকে তোমরা ঐ গুহাটার ভিতরে নিয়ে চলো। এই ব'লে পাশের একটি গুহা দেখিয়ে দিল সে।

ওরা তখন এডমণ্ডকে ধরাধরি ক'রে সেই গুহার ভিতরে নিয়ে নামিয়ে রাখলো। যতক্ষণ তাকে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো ততক্ষণই এডমণ্ড চীৎকার করছিলো।

গুহার ভিতর নামিয়ে রাখতেই এডমণ্ড বললো—আমার আর এখান থেকে নড়বার উপায় নেই ভাই। তোমরা বরং আমার খাবার এখানেই এনে দাও।

জ্যাকোপো বললো—কিন্তু ভাই আমাদের যে আজই রওনা হ'তে হবে। আজ রওনা না দিলে নির্দিষ্ট সময়ে জায়গামত পৌঁছাতে পারব না আমরা।

এডমণ্ড বললো—তোমরা যাও ভাই। আমাকে বরং ফিরবার পথে তুলে নিয়ে যেও।

জ্যাকোপো বললো—তা কি ক'রে হয়? তোমাকে একা এই দ্বীপে ফেলে রেখে আমরা যাই কি ক'রে?

এডমণ্ড বললো—কিন্তু উপায় তো নেই ভাই। কাপ্তেনকে ব'লে আমার জন্য কিছু বিস্কুট, এক কলসী জল, একটা কুড়ুল, একটা গাঁইতি আর কিছু গুলিবারুদ নিয়ে এসো। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো।

জ্যাকোপো আর তার সঙ্গীরা তখন কাপ্তেনের কাছে ফিরে গিয়ে এডমণ্ডের অবস্থার কথা বলতেই সে বললো—বেশ! তবে তাই হোক। না গিয়ে যখন উপায় নেই আমাদের, তখন এ ছাড়া আর উপায় কি?

কাপ্তেনের আদেশে তখন এডমণ্ডের জন্য দিন সাতেকের মত খাবার, আর তার চাওয়া জিনিসগুলি নিয়ে চললো জ্যাকোপো আর তিন চারজন লোক। বলা বাহুল্য পাঁঠার রোস্টও নিয়ে যাওয়া হ'লো এডমণ্ডের জন্য।

এডমণ্ড জিনিসগুলো পেয়ে মনে মনে খুশী হ'লেও মুখে বললো—তাহ'লে এসো ভাই, তোমাদের আর আটকে রাখতে চাই না। আমি এইখানেই অপেক্ষা করবো তোমাদের জন্য। ফিরবার পথে আমাকে তুলে নিয়ে যেও কিন্তু।

জ্যাকোপো আর তার সঙ্গীরা সাশ্রুনয়নে বিদায় নিলো এডমণ্ডের কাছ থেকে।

ঐদিনই 'এমেলিয়া' জাহাজখানা চ'লে গেল ওখান থেকে।

বার

আসলে এডমণ্ডের আঘাতটা সাংঘাতিক কিছু হয়নি। সঙ্গীদের ওখান থেকে বিদায় করবার জন্তই সে ঐভাবে অভিনয় করেছিল। তাই জ্যাকোপো আর তার সঙ্গীরা চ'লে যেতেই সে উঠে বসলো।

উঠে ব'সে মনের আনন্দে পেট ভ'রে পাঁঠার রোস্ট খেয়ে আবার সে শুয়ে পড়লো সেই গুহার মধ্যে। সে ভাবলো যে, আজ আর কিছু করা হবে না। জাহাজ চ'লে গেলে কাল যা হয় করা যাবে।

সে-রাত্রি ঐ গুহার মধ্যে শুয়েই কাটলো তার।

পরদিন সকালে উঠেই সে তৈরী হয়ে নিলো। বন্দুকটা এক কাঁধে ঝুলিয়ে, বারুদের থলেটাকে আর এক কাঁধে। তারপর কুড়ুল আর গাঁইতি হাতে নিয়ে এগিয়ে চললো সে।

আবার সেই মরা নদী। আর সেই পার্বত্য পথ।

গতকালের নিশানা লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললো সে।

একে একে উনিশটি পাহাড়ের চূড়া পার হয়ে কুড়ি নম্বর চূড়ার সামনে সে যখন এসে পৌঁছলো বেলা তখন প্রায় দুপুর।

কুড়ি নম্বর চূড়ার কাছে এসে দক্ষিণ দিকে চললো সে। একটু যেতেই সে দেখতে পেলো পাহাড়ের গায়ে একখানা বিরাট পাথর আটকে আছে। পাথরখানা দেখে তার মনে হ'লো যে ওখানা কেউ টেনে এনে রেখেছে সেখানে, কারণ পাহাড়ের সঙ্গে ঐ পাথরখানার কোনো সম্বন্ধ নেই। ওখানা একখানা বিচ্ছিন্ন পাথর। কিন্তু অতবড় একটা বিরাট পাথর কে টেনে আনলো ওখানে? এ যে একটা হাতির পক্ষেও সম্ভব নয়! সে তখন পাথরের অবস্থানটা ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে লাগলো। তার মনে হ'লো পাথরখানা উপর থেকে গড়িয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। হয়তো এখানে কোন কিছু দিয়ে বাধা সৃষ্টি ক'রে গড়ানো পাথরখানাকে আটকে ফেলা হয়েছিল।

নিশ্চয়ই তাই !

সে তখন পাথরখানার অবস্থান আর একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো। তার মনে হ'লো যে পাথরখানাকে যদি কোন রকমে একটু সরানো যায় তাহ'লে নিশ্চয়ই ওখানা নীচে গড়িয়ে পড়বে।

এই কথা ভেবে সে নিকটস্থ একটা গাছ থেকে একখানা সরু অথচ মজবুত ডাল কেটে এনে সেই ডাল দিয়ে চাড় দিতে চেষ্টা করলো পাথরখানাকে।

কিন্তু মুস্কিল হ'লো এই যে, ডালখানা পাথরের নীচে ঢোকাতে পারা গেল না।

এডমণ্ড তখন গাঁইতি দিয়ে পাথরের কিনারে কোপাতে আরম্ভ করলো। মিনিট কয়েক কোপাতেই গাঁইতিখানার মুখ হঠাৎ একটা ফাঁপা জায়গার মধ্যে ঢুকে গেছে ব'লে মনে হ'লো তার। এই ব্যাপার দেখে তার বুঝতে দেরী হ'লো না যে, ঐ পাথরের নীচেই আছে সেই গুহার মুখ। সে তখন গাছের সেই ডালখানাকে সেই ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চাড় দিতে লাগলো। কিন্তু চাড় দিলে কি হবে, পাথরখানা একটুও নড়লো না।

শত শত বৎসর পাথরখানা ওখানে থাকার ফলে তার চারিদিকের মাটি এমন শক্তভাবে এঁটে ছিল পাথরখানার গায়ে যে এডমণ্ডের পক্ষে সম্ভব হ'লো না ওখানাকে স্থানচ্যুত করতে।

এই সময় হঠাৎ তার মনে পড়লো থলের বারুদের কথা। সে ভাবলো যে খানিকটা বারুদ পাথরের নীচে ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে হয়তো কাজ হবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ।

সে তখন গাঁইতির সাহায্যে পাথরের নীচে একটা গর্ত তৈরি ক'রে তার মধ্যে বারুদ ঢুকিয়ে ভাল ক'রে চাপা দিল। তারপর থলে থেকে একগাছা দড়ি বের ক'রে পল্‌তের মত ঢুকিয়ে সেটাকে অনেকটা দূরে নিয়ে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল।

একটু পরেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হ'লো সেই পাথরের নীচে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরখানা নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পাথরখানা স'রে যেতেই এডমণ্ড দেখলো যে একটা গুহার মুখ বেরিয়ে পড়েছে তার নীচে থেকে।

সে তখন এগিয়ে গেল সেই গুহার দিকে। কিন্তু কি সর্বনাশ! ওটা কি?

এডমণ্ড দেখলো, একটি বিরাট অজগর সাপ এঁকে বেঁকে বেরিয়ে আসছে সেই গুহার ভিতর থেকে। এত বড় সাপ এডমণ্ড জীবনেও দেখেনি। ভয়ে তার কপাল ঘেমে উঠলো। গুহার মধ্যে ঢুকতে সাহস হ'লো না তার।

তার আরও মনে হ'লো যে সাপ না থাকলেও এই তিন শ' বছরের চাপা গুহার মধ্যে যে বিযাক্ত গ্যাস তৈরী হয়ে আছে, সেই গ্যাস নাকে ঢুকলে অবধারিত মৃত্যু।

এডমণ্ড তখন অপেক্ষা করতে লাগলো ঐ গ্যাস বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। সে ভালো ক'রেই জানতো যে বাতাসের স্পর্শ পেলেই গ্যাস উপরের দিকে উঠতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা ক'রে সে ভগবানের নাম নিয়ে ঢুকে পড়লো সেই গুহার মধ্যে!

গুহাটা খুব বড় নয়। সে দেখতে পেলো এক কোণে একটা কাঠের বাক্স তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ করা রয়েছে।

সে তখন তার বন্দুকের নল দিয়ে তালাটার গায়ে আঘাত করতেই সেটা গুঁড়ো হয়ে গেল!

তালাটা গুঁড়ো হয়ে যেতেই সে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললো। বাক্সের ভিতরটা ছিল তিন ভাগে ভাগ করা। প্রথম ভাগে রাশীকৃত সোনার বাট, দ্বিতীয় ভাগে সোনার মোহর, আর তৃতীয় ভাগে হীরে চুনী পান্না প্রভৃতি মহামূল্য মণিমুক্তা।

ওরে বাপরে ! এ যে রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও বেশী !

উত্তেজনায় এডমণ্ডের কপাল দিয়ে টস্ টস্ ক'রে ঘাম ঝরতে লাগলো।

এই বিপুল ঐশ্বর্য হাতে পেয়ে তার মাথা ঘুরে উঠলো। প্রথমেই তার মনে হ'লো কি উপায়ে এগুলো এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়।

অনেক চিন্তা ক'রে সে দেখলো যে এখন বেশী কিছু নিতে গেলে বিপদ হবে। যদি তার সঙ্গীরা ঘুণাক্ষরেও এই গুপ্তধনের কথা জানতে পারে তাহ'লে বন্ধু ব'লে তারা তাকে রেহাই দেবে না। তাকে হত্যা ক'রে ঐ ধনরত্ন কেড়ে নেবে তারা।

সে তখন দুই মুঠো ভরতি ক'রে হীরে জহরত তুলে তার বেল্টের সঙ্গে সংলগ্ন থলেয় ভরতি ক'রে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো।

তারপর সে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তার সঙ্গীদের জন্য।

তের

ছয়দিনের দিন 'এমিলিয়া' জাহাজখানা আবার ফিরে এলো। এডমণ্ডকে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাপ্তেন বোট পাঠিয়ে দিল তাকে নিয়ে আসতে।

এডমণ্ড জাহাজে উঠলে কাপ্তেন বললো—তোমাকে এখানে রেখে গিয়ে আমার মনটা খুব খারাপ লাগছিল। কেমন আছ এখন?

এডমণ্ড বললো—ভাল।

এই সময় জ্যাকোপো কাপ্তেনকে বললো—কিন্তু কাপ্তেন, এবারের টাকার ভাগ তো আমাদের বন্ধুরও পাওয়া উচিত।

কাপ্তেন বললো—ও যদি আমাদের সঙ্গে যেতো তাহ'লে পেতো বৈ কি।

কাপ্তেনের এই কথায় জ্যাকোপো বললো—কিন্তু ও তো এখানে নিজের ইচ্ছায় থাকেনি, তাই আমার ইচ্ছা, ওকেও সমান ভাগ দেওয়া হোক। তবে আপনি যদি নিতান্তই ভাগ দিতে রাজী না হ'ন, তাহ'লে আমিই আমার ভাগের টাকার অর্ধেক ওকে দেবো।

কাপ্তেন হেসে বললো—তোমার ভাগের অর্ধেক আর দিতে হবে না। ওকে সমান অংশই দেওয়া হবে।

এই ব'লে পকেট থেকে এক গোছা নোট বের ক'রে তা থেকে পঞ্চাশ পিয়েস্তা এডমণ্ডকে দিয়ে সে বললো—এই নাও বন্ধু তোমার ভাগ

এডমণ্ড নিঃশব্দেই নোটগুলো নিয়ে পকেটে ফেললো। তারপর সে জিজ্ঞাসা করলো—এবার কোন্ দিকে যাওয়া হচ্ছে বন্ধু?

কাপ্তেন বললো—লেগহর্ন বন্দরে।

* * *

লেগহর্ন বন্দর।

জাহাজীদের ফুর্তির সব রকম ব্যবস্থাই এখানে আছে। অনেক দিন জাহাজে আটকে থেকে নাবিকরা সবাই উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। কথা হ'লো, জাহাজ এখানে কিছুদিন থাকবে।

সবাই নেমে পড়লো বন্দরে।

সবাই যে যার মত ছুটলো আনন্দের শিকার খুঁজতে। এডমণ্ড

বেরিয়ে পড়লো পথে। তার পকেটে তখন ছোটখাট রাজার দৌলৎ।

রাস্তায় এক ইহুদী মণিকারের দোকানে ঢুকে পড়লো সে। বুড়ো দোকানদার তার দিকে তাকিয়ে সন্দেহের সুরে জিজ্ঞাসা করলো—কি চাই মঁসিয়ে?

এডমণ্ড বললো—দোকানের মালিকের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বৃদ্ধ বললো—কি কথা আছে বলুন? আমিই এই দোকানের মালিক।

এডমণ্ড বললো—আমি কিছু হীরে বিক্রী করতে চাই। আমার পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি।

বৃদ্ধ বললো—সঙ্গে আছে।

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা ভিতরে আসুন।

এডমণ্ড দোকানের ভিতরে যেতেই বৃদ্ধ তাকে সঙ্গে ক'রে তার খাস কামরায় নিয়ে গেল।

খাস কামরায় গিয়ে এডমণ্ড পকেট থেকে চারখানা হীরে বের ক'রে বৃদ্ধের সামনে টেবিলের উপরে রেখে বললে—দেখুন তো, কি দাম পাওয়া যেতে পারে এর!

তার ভয় হ'তে লাগলো যে ইহুদী বুড়ো হয়তো তাকে জেরা করতে আরম্ভ করবে।

বৃদ্ধ কিন্তু জেরার ধারে কাছেও গেল না। সে হীরে ক'খানাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললো—এক এক খানার দাম পাঁচ হাজার ফ্রাঁ ক'রে দিতে পারি আমি।

এডমণ্ড আর দরকষাকষি না ক'রে বিশ হাজার ফ্রাঁতেই* দিয়ে দিল হীরে চারখানা। ইহুদী বুড়োও এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করলো না। কারণ সে জানতো যে ঐ হীরেগুলো বেচে কম ক'রেও চার হাজার ফ্রাঁ লাভ করবে সে।

* বিশ হাজার ফ্রাঁ আমাদের দেশের প্রায় তিন লাখ টাকা।

পরদিন জ্যাকোপোকে একান্তে ডেকে এডমণ্ড বললো—তুমি যদি আমার হয়ে একটা কাজ ক'রে দাও তাহ'লে বড় উপকার হয়।

—কি কাজ ?

—মার্সেঈ বন্দরে গিয়ে এলিজ ছ্য মিলান গ্রামের লুই দান্তে নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের খবর এনে দিতে হবে।

—আর ?

—আর কাটালান গ্রামের মার্সেদেস নামে একটি মেয়ের খবর।

—আর কিছু।

—না।

—কিন্তু আমি যাব কি ক'রে সেখানে ?

—সে জন্য তোমাকে মোটেই ভাবতে হবে না। আমি একখানা স্টীমার ভাড়া ক'রে দিচ্ছি তোমাকে, আর তোমার পারিশ্রমিক বাবদ এক শ' ফ্রাঁ অগ্রিম দিচ্ছি।

এই ব'লেই পকেট থেকে এক গাদা নোট বের ক'রে তা থেকে এক শ' ফ্রাঁর নোট জ্যাকোপোর হাতে দিল সে।

জ্যাকোপো আশ্চর্য হয়ে বললো—এত টাকা তোমার কাছে !—কি ব্যাপার ?

এডমণ্ড মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ ভাই, আমি হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছি। এখানে আমার এক আত্মীয় থাকতেন। আমি ছাড়া তাঁর আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনি মারা যাবার সময় তাঁর যা কিছু সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গেছেন। কাল সেখানে যেতেই আমি জানতে পারি এই খবর।

জ্যাকোপো অবিশ্বাস করলো না তার কথা। আর অবিশ্বাস করবেই বা কি ক'রে ! নিজের চোখেই তা দেখতে পেলো, যে এডমণ্ডের পকেটে কম পক্ষে হাজার ফ্রাঁর নোট।

এর পর জ্যাকোপোকে সঙ্গে ক'রে জাহাজঘাটে গিয়ে একখানা স্টীমার ভাড়া ক'রে দিয়ে বললো—তুমি ফিরে এসে আমাকে দেখতে না পেলে জাহাজঘাটের কাছে ঐ হোটেলে অপেক্ষা ক'রো, কেমন ?

জ্যাকোপো বললো—তুমি এখন কি করবে বন্ধু ?

—কিছুই ঠিক নেই, তবে 'এমিলিয়া' জাহাজে চাকরি করবো না যে, এটা ঠিক।

ঐ দিনই জ্যাকোপো রওনা হয়ে গেল মার্সেঈ-এর পথে।

এদিকে এডমণ্ড জাহাজে গিয়ে তার হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কথা ব'লে বিদায় চাইলো সবার কাছে। জাহাজ থেকে চ'লে আসার সময় প্রত্যেক লোককে সে এক শ' ফ্রাঁ ক'রে পুরস্কার দিয়ে এলো।

কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিতে গেলে সে এডমণ্ডের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বললো—দরকার হ'লে 'এমিলিয়া' জাহাজের এই গরীব কাপ্তেনকে ভুলো না বন্ধু।

এর দুদিন পরে সমুদ্রে একখানা সুন্দর ছোট জাহাজ দেখে এডমণ্ড খোঁজ নিয়ে জানলো যে ঐ জাহাজখানা একজন ইংরেজ ভদ্রলোক চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে কিনেছেন। জাহাজখানার গঠন ও সৌন্দর্য দেখে এডমণ্ডের ইচ্ছা হ'লো ওখানা কিনে নিতে। সে তখন সেই জাহাজের মালিকের সঙ্গে দেখা ক'রে ষাট হাজার ফ্রাঁ দরে কিনতে চাইলো জাহাজখানা।

চল্লিশ হাজার ফ্রাঁতে জাহাজ কিনে দুদিনেই বিশ হাজার ফ্রাঁ লাভ পেয়ে জাহাজের মালিক সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। এডমণ্ড তখন এক বড় মণিকারের দোকানে গিয়ে আরও কয়েকখানা হীরে বিক্রি ক'রে সেই দিনই জাহাজখানা কিনে ফেললো।

জাহাজ কেনা হয়ে গেলে সেই ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন—আপনার যদি ক্রু আর খালাসী দরকার হয় তাহ'লে আমার লোকদের রাখতে পারেন আপনি।

এডমণ্ড বললো—তার দরকার হবে না। আমি একাই পারবো এই জাহাজ চালিয়ে যেতে। একা একা ইচ্ছামত সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার জন্যই আমি জাহাজখানা কিনলাম।

ইংরাজ ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন এডমণ্ডের কথায়। শুধু

তিনি কেন, লেগহর্নের বহু লোকই অবাক হয়ে গিয়েছিল, যখন তারা দেখলো যে জাহাজের মালিক কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর জাহাজখানা।

এখানে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। কথাটা হচ্ছে এই যে জাহাজখানা কিনবার পরেই এডমণ্ড তার নিজস্ব কেবিনে তিনটি খোপওয়ালা একটা বড় সিন্দুক তৈরি ক'রে নিয়েছিল।

কয়েকদিন পরেই আবার ফিরে এলো এডমণ্ড। এ ক'দিন সে জাহাজ নিয়ে কোথায় গিয়েছিল কেউই তা জানতে পারলো না।

বন্দরে এসে এডমণ্ড দেখতে পেলো যে জ্যাকোপো ফিরে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

এডমণ্ড তাকে জিজ্ঞাসা করলো—কি বন্ধু, খবর পেলে তাঁদের?

জ্যাকোপো বললো—বৃদ্ধের খবর পেয়েছি। তিনি মারা গেছেন।

—আর সেই মেয়েটি?

—তার কোন খোঁজ পেলাম না। ওখানকার কোন লোকই বলতে পারলো না তার কথা।

হঠাৎ চোখে জল এসে পড়লো এডমণ্ডের।

জ্যাকোপো জিজ্ঞাসা করলো—কি হ'লো বন্ধু?

এডমণ্ড বললো—কিছু না। তুমি যে খবরটা এনে দিলে এর জন্য আমার ধন্যবাদ নাও। আর সেই সঙ্গে বন্ধুর কাছ থেকে সামান্য কিছু প্রীতি উপহার···।

এই ব'লে পকেট থেকে এক শ' ফ্রাঁর নোট বের ক'রে জ্যাকোপোর হাতে দিয়ে সে আবার বললো—বিদায় বন্ধু! জীবনে আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু তোমাকে আমি কোনো দিনই ভুলবো না।

চোদ্দ

টাকা থাকলে দুনিয়ায় অনেক কিছুই সম্ভব হয়; তাই এডমণ্ড দান্তেও টাকার জোরে লর্ড উইলমোর হয়ে গেল। এই নামেই 'পাসপোর্ট'ও বের ক'রে নিল সে। কোথাকার লর্ড, কি তার বংশ-পরিচয়—এসব কোন প্রশ্নই বাধা হয়ে দাঁড়ালো না তার পাসপোর্ট জোগাড় করবার ব্যাপারে। সবাই ভাবলো—যাঁর পকেটে সব সময় কয়েক লাখ ফ্রাঁর নোট থাকে, তিনি লর্ড ছাড়া আর কি হবেন?

এইভাবে নিজেকে লর্ড তৈরি ক'রে এডমণ্ড ভাবলো যে লর্ডের মত চালে থাকতে হ'লে তার কিছু আয়ের পথ তৈরি করা দরকার। অন্ততঃ লোক দেখানোর জন্যও তার এমন কোন সম্পত্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তগত করা দরকার যাতে কারো মনেই কোন রকম সন্দেহ আসতে না পারে। এই সব কথা চিন্তা ক'রে এডমণ্ড সোজা চ'লে গেল রোমে। এডমণ্ড যখন ফাঁরাও জাহাজে চাকরি করতো, সেই সময়েই সে জানতো যে রোমের বিখ্যাত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান "মেসার্স টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ" কোম্পানির সঙ্গে "মোরেল" কোম্পানির লেনদেন আছে।

এই "টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ" কোম্পানির নাম জানতো না, সে রকম লোক ইউরোপে তখন খুব কমই ছিল।

এডমণ্ড সোজা গিয়ে সেই কোম্পানির মালিকের সঙ্গে দেখা ক'রে কোম্পানিটা তাকে বিক্রি ক'রে দিতে অনুরোধ জানালো। "টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ" কোম্পানির মালিক একজন অপরিচিত লোকের মুখে এইরকম অভাবনীয় প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"টমসন এণ্ড ফ্রেঞ্চ" কোম্পানির সুনামের (Goobwill) দাম কি রকম হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে কি?

এডমণ্ড হেসে বললো—কিছু কিছু আছে বৈ কি? কিন্তু যে দামই আপনি চান, আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি, আর চান তো দামটা আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিতে প্রস্তুত।

মালিক তখন আগন্তুকের আর্থিক অবস্থা বুঝবার জন্য একটা অবিশ্বাস্য অঙ্ক দাবী ক'রে বসলেন।

দাবীর অঙ্কটা শুনে এডমণ্ড কিন্তু মোটেই ঘাবড়ালো না। একটু হেসে সে বললো—টাকাটা কি এখনই চান?

—এখনই চাই! তার মানে? আপনি এত টাকা পকেটে ক'রে নিয়ে এসেছেন নাকি?

এডমণ্ড তখন তার হাতের ছোট্ট এ্যাটাচি কেসটা খুলতে খুলতে বললো—এই সামান্য টাকাও যদি সঙ্গে না থাকে, তা'হলে কি "টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্" কোম্পানীর মত বিখ্যাত কোম্পানি কিনতে সাহসী হই?

এই ব'লে সত্যি সত্যিই সে এক গাদা নোট বের ক'রে মালিকের টেবিলের উপর রেখে বললে—গুনে নিন্।

ঐ দিনই লেখাপড়া হয়ে গেল। "টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্" কোম্পানির নূতন মালিক হলেন লর্ড উইলমোর।

এর কয়েকদিন পরে এলিজ দ্য মিলান গ্রামের একখানা চারতলা বাড়ির দরজার সামনে একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

বাড়ির লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—কাকে চান আপনি?

ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন—এই বাড়ির চারতলায় লুই দান্তে নামে একজন বৃদ্ধ থাকতেন; তাঁর কোন খবর আপনারা জানেন কি?

—লুই দান্তে! না মশাই, ওরকম নামের কোন লোক এ বাড়িতে ছিলেন কিনা বলতে পারি না। আপনি বরং চারতলায় যে ভদ্রলোক আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ইংরেজ ভদ্রলোক তখন চারতলায় উঠে গিয়ে একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবলেন, তারপর ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত ক'রে বললেন—ভিতরে কে আছেন, দয়া ক'রে একটু বাইরে আসবেন কি?

একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললেন—কি চাই আপনার?

—না, চাইনে কিছু, এই ঘরে অনেকদিন আগে আমার এক আত্মীয় থাকতেন কিনা!

—কি নাম আপনার আত্মীয়ের ?

—লুই দান্তে।

—লুই দান্তে !

—হ্যাঁ, লুই দান্তে, তাঁর কি হয়েছে বলতে পারেন কি ?

—তা তো জানি না। আপনি বরং বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

—বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা আমি আগেই করেছিলাম। আপনি জেনে রাখুন, এ বাড়ির মালিক এখন আমিই।

—আপনি ! আপনিই কি লর্ড উইলমোর ?

—হ্যাঁ, লোকে ঐ নামেই আমাকে ডাকে বটে।

ভাড়াটে ভদ্রলোক তখন সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে গেলেন লর্ড উইলমোরের সামনে। তিনি বললেন—আমার প্রতি কোন আদেশ আছে কি স্যর।

—আদেশ নয়, অনুরোধ। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে আমার।

—কি অনুরোধ, বলুন ?

—আপনাকে এই ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে ; অবশ্য এর পরিবর্তে আর একটা ফ্ল্যাট আপনাকে দিতে রাজি আছি আমি। আমার এই অনুরোধটা যদি আপনি রাখেন, তাহ'লে নূতন ফ্ল্যাটের দরুন আপনাকে কোন ভাড়া দিতে হবে না।

এরকম লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, এরকম বেকুব ভাড়াটে দুনিয়ার কোথাও থাকতে পারে না। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

লর্ড বললেন—তাহ'লে আর দেরী করবার দরকার নেই, আজই আপনি তেতলার খালি ফ্ল্যাটটাতে চ'লে যেতে পারেন। আরামের দিক দিয়ে ঐ ফ্ল্যাটটি এর থেকে অনেক বেশী কাম্য।

ভাড়াটে ভদ্রলোক কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর জিনিসপত্র তেতলার ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত ক'রে ফেললেন।

লর্ড উইলমোর তখন চারতলার সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বালকের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন,—"বাবা ! বাবা !"

পনের

কয়েক দিন পরের কথা।

সেদিন কাদারুজ তার রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিল, কোন খদ্দের আসে কি না।

সকাল থেকে একজন খদ্দেরও আসেনি সেদিন। আর আসবেই বা কেন? কী আছে কাদারুজের রেস্তোরাঁয়? ভাল ভাল খাবার ওখানে মোটেই তৈরী হয় না। তাছাড়া মদও বেশী থাকে না ওখানে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করছিল সে। ভিতরের ঘর থেকে তার রুগ্‌ণা স্ত্রীর খনখনে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—ওগো! কোথায় গেলে?

কাদারুজ উত্তর দিলো না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার দিকে চেয়ে। তার দৃষ্টি তখন উদাস···করুণ।

এই সময় হঠাৎ তার নজরে পড়লো একজন লোক ঘোড়ায় চ'ড়ে তার রেস্তোরাঁর দিকে আসছে। লোকটিকে দেখে ধর্মযাজক ব'লে মনে হ'লো কাদারুজের।

একটু পরেই সেই ধর্মযাজক মহাশয় তার সামনে এসে ঘোড়াটাকে দাঁড় করালেন।

জিজ্ঞাসা করেন—কিছু খাবার পাওয়া যাবে কি এখানে?

কাদারুজ খুশী হয়ে উঠলো এই মহামান্য অতিথির আগমনে। মনে মনে ভাবলো, নাঃ! ভগবানের দয়া আছে বলতে হবে।

মুখে বললো—নিশ্চয়ই, দয়া ক'রে ভিতরে আসুন।

ধর্মযাজক ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তারপর ঘোড়াটাকে বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে ভিতরে এলেন।

ধর্মযাজক ভিতরে ঢুকে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললেন—মঁসিয়ে কাদারুজ নামে কোন লোক এখানে থাকেন কি?

—আমারই নাম কাদারুজ।

এরপর একটু বিস্মিত হয়েই সে আবার বললো—কিন্তু আমার নাম আপনি জানলেন কি ক'রে ধর্মাত্মন্?

অনেক খোঁজ ক'রে আপনাকে আমি বের করেছি। যাই হোক,

সেসব কথা পরে বলাও চলবে, আগে কিছু খাবার আর এক গ্লাস ভাল মদ এনে দিন তো ! বড্ড খিদে পেয়ে গেছে আমার।

কাদারুজ ব্যস্ত হয়ে উঠলো ধর্মযাজকের এই কথায় ! তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে ঐদিনের যা কিছু ভাল খাবার ছিল প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এলো। এক গ্লাস মদও নিয়ে এলো সে এই মান্যবর অতিথির জন্য।

খেতে খেতে ধর্মযাজক বললেন—এইবার শুনুন, কি জন্য আপনার কাছে এসেছি আমি।

কাদারুজ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ধর্মযাজকের পাশে ব'সে বললো—বলুন।

ধর্মযাজক বললেন—এডমণ্ড দান্তে ব'লে কোন লোককে আপনি চিনতেন কি ?

—চিনতাম বৈকি ! এডমণ্ড আমার বিশেষ বন্ধু ছিল ! সে কোথায় আছে এখন, বেঁচে আছে তো ?

—না, সে মারা গেছে।

—মারা গেছে ? কবে ? কোথায় ?

—অনেকদিন আগে, স্যাটু-ড্য-ইফ্ কারাগারে।

এই কথা শুনে কাদারুজের মুখখানা হঠাৎ যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললো—বেচারা এডমণ্ড ! কোন অপরাধ না ক'রেও কারাগারে মৃত্যু হ'লো তার, অথচ তার শত্রুরা আজ—

এই পর্যন্ত ব'লেই হঠাৎ চুপ ক'রে গেল সে।

ধর্মযাজক বললেন—'শত্রুরা' কি বলছিলেন ?

অতিকষ্টে আত্মদমন ক'রে কাদারুজ বললো—ও কিছু না। যাই হোক ! এডমণ্ড সম্বন্ধে কি জানতে চান আমার কাছে ?

—জানতে চাই অনেক কথাই। মৃত্যুকালে সে আমাকে একটা অনুরোধ করেছিল। মৃত্যুপথযাত্রীর সেই শেষ অনুরোধ রক্ষা করতেই আমি এসেছি।

—কি অনুরোধ করেছিল সে, জানতে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই পারেন। সে আমার হাতে একখানা দামী হীরে তুলে দিয়ে অনুরোধ করেছিল, ঐ হীরেখানা বিক্রী ক'রে যে টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকা পাঁচজন লোকের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ ক'রে দিতে হবে। এই পাঁচজনের মধ্যে আপনিও একজন।

কাদারুজ আশ্চর্য হয়ে বললো—হীরে! এডমণ্ড হীরে কোথায় পেলো?

ধর্মযাজক হেসে বললেন—সে এক কাহিনী। এডমণ্ড মারা যাবার আগে আমাকে ব'লে গিয়েছিল সে কথা। সে বলেছিল যে ঐ হীরেখানা ধর্মযাজক ফারিয়া মরবার সময় তাকে দিয়ে যান।

—ধর্মযাজক ফারিয়া! জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ফারিয়ার কথা বলছেন কি আপনি?

—হ্যাঁ, তিনিই। শুনেছেন বোধ হয়, রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে কারাগারে রাখা হয়েছিল। কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হীরেখানা এডমণ্ডের হাতে দিয়ে যান।

এই ব'লে পকেট থেকে ছোট একটা চামড়ার বাক্স বের ক'রে সেটাকে খুলে ফেললেন তিনি।

কাদারুজ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো, বাক্সের মধ্যে বড় একখণ্ড মিছরির টুকরোর মতো একখানা হীরে জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

অতবড় হীরে কাদারুজ জীবনেও দেখেনি, তাই সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কত দাম হবে হীরেখানার?

—তা পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ ত বটেই!

—কি বললেন? প—ঞ্চা—শ—হা—জা—র—ফ্রাঁ!

ধর্মযাজক বললেন—তা তো হবেই, কিছু বেশীও হ'তে পারে। যাই হোক, এইবার শুনুন এডমণ্ডের কথা।

কাদারুজের দৃষ্টি তখনও সেই হীরেখানার দিকে। অতিকষ্টে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে এনে সে বললো—বলুন!

ধর্মযাজক বলতে আরম্ভ করলেন—জেলখানার কয়েদীদের মৃত্যুর পূর্বে ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। আমারই উপর

পড়েছিল তার শেষ যাত্রার পথ সুগম করবার ভার! আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন তার মৃত্যুর আর বেশী দেরী ছিল না। আনুষ্ঠানিক ভাবে বাইবেল পাঠ শেষ হয়ে গেলে সে আমাকে এই হীরেখানা দিয়ে অনুরোধ করলো—"এই হীরেখানা বিক্রি ক'রে আমার পাঁচজন আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে সমান ভাবে ভাগ ক'রে দেবেন।"

এই পাঁচজনের মধ্যে প্রথমেই ছিল লুই দান্তের নাম।

কাদারুজ ব'লে উঠলো—হ্যাঁ, তিনি আজ আর বেঁচে নেই, শেষ সময়টা খুবই দুঃখ-কষ্টে কেটেছে তাঁর।

—তাঁর কি কোন অসুখ করেছিল?

ধর্মযাজকের এই প্রশ্নে ম্লান হেসে কাদারুজ বললো—অসুখ! হ্যাঁ, অসুখ একটা কিছু নিশ্চয়ই করেছিল। তবে আমি যতদূর জানি, তিনি না খেতে পেয়ে মারা গেছেন।

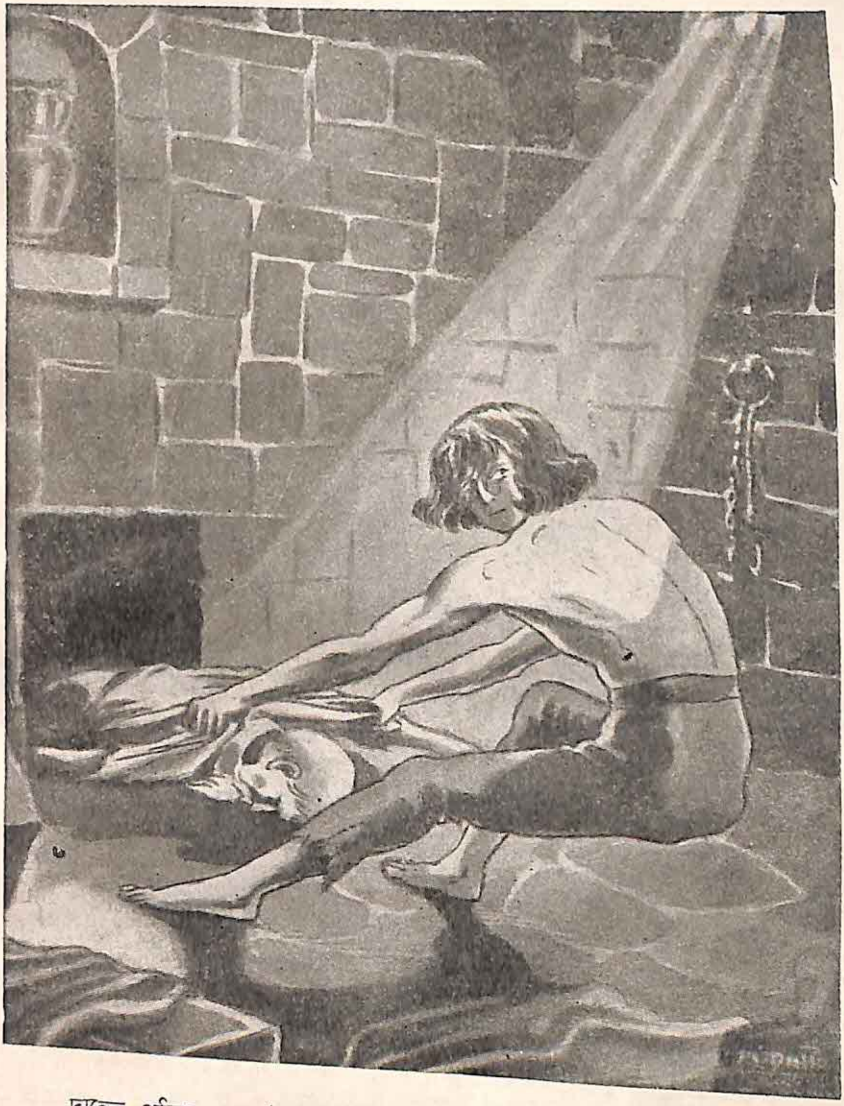
—কি বললেন! না খেতে পেয়ে মারা গেছেন তিনি!

ধর্মযাজকের কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে এলো।

তাঁর হঠাৎ ঐ রকম ভাবান্তর দেখে কাদারুজ ব্যস্ত হয়ে বললো—না, মানে আমি ঠিক জানি না, তবে লোকে সেইরকমই বলতো বটে।

ধর্মযাজক তখন সহজ কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর সম্বন্ধে আপনি যা জানেন, দয়া ক'রে খুলে বলুন আমাকে!

কাদারুজ বললো—কি আর বলবো ধর্মাত্মন! বৃদ্ধ ছিলেন খুবই ভাল লোক। আমি তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই জানতাম। একই বাড়িতে আমরা থাকতাম। আমি তখন দরজীর কাজ করি। এডমণ্ড ধরা পড়বার পর থেকেই তিনি যেন কেমন হয়ে যান। কারও সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলতেন না। কারও কাছ থেকে কোন রকম সাহায্যও তিনি চাইতেন না। একমাত্র মঁসিয়ে মোরেলই তাঁকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য ক'রে গেছেন। মঁসিয়ে মোরেল অবশ্য উপযাচক হয়েই সাহায্য করতেন। আর একটি মেয়ে তাঁকে সাহায্য করতো, তার



দান্তে থলির সেলাই কেটে, বাইরে টেনে আনলে ফারিয়ার মৃতদেহ।

নাম মার্সেদেস। এডমণ্ড ধরা না পড়লে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই তার বিয়ে হতো।

—কী বললেন? মার্সেদেস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার নামও যে লেখা আছে আমার নোট বইতে! সে এখন কোথায় আছে বলতে পারেন?

—পারি বৈ কি! সে এখন প্যারিসের একজন বিখ্যাত মহিলা কাউন্টেস-দ্য-মারকার্ফ।

—কাউন্টেস-দ্য-মারকার্ফ! কে এই কাউন্ট?

—আগে এর নাম ছিল ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু।

কাদারুজের এই কথায় ধর্মযাজক হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। তারপর অতিকষ্টে মনের ভাব গোপন ক'রে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—এই কাউন্টের সঙ্গে মার্সেদেস-এর বিয়ের ইতিহাসটা দয়া ক'রে বলবেন কি?

—বলবো বৈকি? আগেই বলেছি ঐ কাউন্টের নাম ছিল ফার্নান্দ্। সে মার্সেদেসকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এডমণ্ড বাইরে থাকতেই।

—তারপর?

—মার্সেদেস কিন্তু মোটেই আমোল দিত না তাকে। সে মনে-প্রাণে এডমণ্ডকেই ভালবাসতো।

কাদারুজের এই কথায় ধর্মযাজক হেসে উঠে বললেন—হ্যাঁ, মনে-প্রাণে ভালবাসার নমুনাই সে দেখিয়েছে বটে!

ধর্মযাজকের এই কথায় আহত হয়ে কাদারুজ বললো—এ কথা বলবেন না ধর্মাত্মন! আমি জানি এডমণ্ডকে সে কতখানি ভালবাসতো! এডমণ্ডের জেল হবার পর ফার্নান্দ্ তার কাছে বহুবার বিয়ের প্রস্তাব করে, কিন্তু প্রতিবারই সে ঘৃণার সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। প্রায় তিনটি বৎসর সে অপেক্ষা করেছিল এডমণ্ড ফিরে আসবে এই আশায়। কিন্তু শেষে যখন তার মৃত্যু-সংবাদ এনে দেখায় ফার্নান্দ, তখন সে একেবারে ভেঙে পড়ে।

—মৃত্যু-সংবাদ এনে দেখায়! কী ব্যাপার বলুন তো?

—ঠিকই বলছি। ফার্নান্দ্ তাকে প্রকিওরার-এর সইকরা একখানা

চিঠি দেখায়। ঐ চিঠিতে লেখা ছিল যে এডমণ্ড জেলখানায় মারা গেছে।

—তারপর ?

—তারপরও ফার্নান্দ্‌কে বিয়ে করতে সে চায় না। কিন্তু ক্রমে তার অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে ওঠে যে, নিতান্ত বেঁচে থাকবার প্রয়োজনেই সে ফার্নান্দ্‌কে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

—কিন্তু ফার্নান্দ্‌ কাউণ্ট হ'লো কি করে ?

—সে এক লম্বা ইতিহাস। নেপোলিয়ান যখন এল্‌বা থেকে ফিরে আসেন, সে তখন তাঁর সেনাদলে যোগ দেয়। তারপর ওয়াটারলুর যুদ্ধের কিছুদিন আগে সে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁর শত্রুপক্ষে যোগ দেয়, ফলে তার পদোন্নতি হয়। ফার্নান্দ্‌ জাতিতে ছিল স্পেনিস্‌। স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের যখন যুদ্ধ বাধে সেই সময় সে স্পেনের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করে। যে সেনাধ্যক্ষের অধীনে সে কাজ করতো, সে তখন জেনিনার সুলতান আলী পাশার সেনাপতি হয়ে জেনিনায় চ'লে যায়। ফার্নান্দ্‌ও যায় তার সঙ্গে। সেখানে গিয়ে ফার্নান্দ্‌ ক্রমে সেনাপতির পদ পায়। তারপর গুপ্তঘাতকের হাতে আলী পাশা নিহত হবার পর ফার্নান্দ্‌ আবার ফ্রান্সে ফিরে আসে। সেনাপতির পদমর্যাদা এবং প্রচুর অর্থ সঙ্গে নিয়ে আসার ফলে এখানেও সে রাজসম্মান লাভ করে। রাজা তাকে কাউণ্ট-দ্য-মারকার্ফ্‌ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

এই সময় ধর্মযাজক বললেন—কিন্তু এডমণ্ডের ইচ্ছা অনুসারে এই ফার্নান্দ্‌কেও যে হীরে বিক্রির টাকা থেকে এক ভাগ দিতে হবে! তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে ফার্নান্দ্‌ও একজন, আর দুজনের মধ্যে একজন আপনি, আর একজনের নাম ড্যাংলার।

কাদারুজ বললো—কি বললেন! ফার্নান্দ্‌ আর ড্যাংলার এডমণ্ডের বন্ধু! হায় ভগবান্‌!

ধর্মযাজক আশ্চর্য হয়ে বললেন—আপনি কি তা'হলে বলতে চান যে ওরা এডমণ্ডের বন্ধু নয় ?

কাদারুজ ম্লান হেসে ব'লে উঠলো—ওরা তার মহাশত্রু। বেচারা এডমণ্ড যদি জানতো যে, ওরাই তাকে জেলে পাঠিয়েছিল, তাহ'লে বোধ হয় ঘৃণায় ওদের নামও সে মুখে আনতো না।

—ওরাই তাকে জেলে পাঠিয়েছিল! বলেন কি মঁসিয়ে কাদারুজ!

—ঠিকই বলছি। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না সে কথা। হয়তো জানতোও না আর কেউ যদি আপনি হঠাৎ তার খবর নিতে না এসে পড়তেন।

এই ব'লে কাদারুজ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলো বহুদিন আগের সেই রেস্তোরাঁর ঘটনা। নিজের কথাও গোপন রাখলো না সে ধর্মযাজকের কাছে।

সব কথা বলা হয়ে গেলে সে বললো—এইবার বুঝলেন তো, কি রকম বন্ধু ওরা এডমণ্ডের।

ধর্মযাজক এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলেন সেই জঘন্য চক্রান্তের কাহিনী। সব শুনে তিনি বললেন—ওরা তো বড় ভয়ানক লোক দেখছি। এ সব কথা জানবার পর আমি কিছুতেই এই হীরের অংশ ওদের দিতে পারি না। এ হীরে আমি আপনাকেই দান করলাম। আমার মনে হচ্ছে এডমণ্ডের পরলোকগত আত্মা এতে সন্তুষ্টই হবে।

এই ব'লে তিনি হীরেখানা কাদারুজের সামনে ঠেলে দিলেন।

কাদারুজ হীরের বাক্সটা টেনে নিল। আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

তার চোখে জল দেখে ধর্মযাজকের চোখেও জল এসে পড়লো। তিনি বললেন—আমি বুঝতে পারছি, মঁসিয়ে কাদারুজ, এডমণ্ডকে আপনি খুবই ভালবাসতেন।

কাদারুজ চোখের জল মুছে বললো—অভাব আর সংসারের চাপে তাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে সে মৃত্যুর সময়েও ভোলেনি। আমি পাষণ্ড, সব জেনেও আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি; আমি······

কাদারুজের কথায় বাধা দিয়ে ধর্মযাজক বললেন—ও সব কথা তুলে দুঃখ পাবেন না মঁসিয়ে। নিয়তির উপর কারো কোন হাত নেই। এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন—আচ্ছা, মঁসিয়ে মোরেলের খবর কিছু জানেন কি?

—মঁসিয়ে মোরেলের খবর? তা জানি বৈকি! তিনি আজ দেনায় ডুবতে বসেছেন। আগের দিনের সেই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা আজ আর তাঁর নেই। শুনতে পাই, এখানকার মেয়র নাকি অনেক টাকা পান তাঁর কাছে। আমার মনে হয়, মেয়রের কাছে গেলেই তাঁর সম্বন্ধে সব খবর পেয়ে যাবেন।

ধর্মযাজক তখন কাদারুজকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লেন ওখান থেকে।

কাদারুজ দরজা পর্যন্ত এসে তাঁকে বিদায় দিলো।

ষোল

মার্সেঈ শহরের মেয়রের আফিস।

বড় একখানা টেবিলের পিছনে ব'সে মেয়র আফিসের কাগজপত্র সই করছেন, এই সময় আর্দালী একখানা কার্ড এনে তাঁর হাতে দিলো।

কার্ডখানার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে মেয়র বললেন—সাবকো সেলাম দো।

একটু পরেই একজন সুবেশ ইংরেজ যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ ক'রে মেয়রকে অভিবাদন করলো।

মেয়র বললেন—বসুন। আপনিই এসেছেন 'টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্' কোম্পানি থেকে?

—হ্যাঁ।

—কি দরকার বলুন?

—আমি এসেছি এখানকার 'মোরেল এ্যাণ্ড সন' নামক জাহাজী কোম্পানি সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে। ঐ কোম্পানির দেনা-সংক্রান্ত সব দলিলপত্র আমরা কিনে নিতে চাই।

—মোরেল কোম্পানির মত দেউলে প্রতিষ্ঠানের দেনা কিনে কোন্ সুবিধে হবে আপনাদের?

—তা বলতে পারি না। আমার মনে হয় ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই এটা করা হচ্ছে। যাই হোক্, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনার কাছে মঁসিয়ে মোরেল কিছু ধারেন। যদি ইচ্ছা করেন ঐ দেনার দলিলপত্র আমাদের কাছে বিক্রি করতে পারেন আপনি।

মেয়র খুশী হয়ে উঠলেন যুবকের কথা শুনে।

তিনি বললেন—কি দাম দিতে চান!

—দেনার পুরো টাকা, আর তার উপরে শতকরা ছ' টাকা হারে সুদ।

—বেশ, আমি রাজী আছি। কবে দিতে পারেন টাকা?

—আজই। প্রয়োজন হ'লে এখুনি।

যুবকের এই কথায় মেয়র বললেন—বেশ, কিন্তু দলিলপত্রগুলো তো এখানে নেই। আপনি যদি দয়া ক'রে বিকালের দিকে আমার বাড়িতে যান, তা'হলে বড় ভাল হয়।

যুবকটি তখন মেয়রের বাড়ির ঠিকানা লিখে নিয়ে আর একবার অভিবাদন জানিয়ে চ'লে গেল।

ঐ দিনই বিকালে।

মেয়রের বাড়িতে ব'সে কথা হচ্ছিল, সেই যুবক আর মেয়রের মধ্যে। মেয়র তাঁর দলিলখানা তখন 'টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্' কোম্পানির নামে হস্তান্তরিত ক'রে দিয়েছিলেন।

কথায় কথায় মেয়র বললেন—আপনারা আরও দলিলপত্র কিনতে চান কি?

যুবকটি আগ্রহের সঙ্গে বললো—নিশ্চয়ই। আমার উপর সেই রকম নির্দেশই দেওয়া আছে কোম্পানির।

—বেশ! আমি তাহ'লে আর একজন ভদ্রলোকের কাছে পাঠাচ্ছি আপনাকে। মোরেল কোম্পানির কাছে মোটা টাকা পান তিনি।

—কি নাম ভদ্রলোকের?

—মঁসিয়ে-ভ্য-বোভাইল। ইনি এখানকার কারাগারসমূহের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল। যদি বলেন তো আমি একখানা চিঠিও লিখে দিতে পারি তাঁর কাছে।

যুবকটি খুশী হয়ে বললো—তাহ'লে তো খুবই ভাল হয়।

মেয়র তখন ব্যক্তিগত ভাবে মঁসিয়ে-ভ্য-বোভাইলকে একখানা চিঠি লিখে যুবকটির হাতে দিয়ে বললেন—এই চিঠিখানা তাঁকে দিলেই কাজ হবে।

যুবকটি মেয়রকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে চিঠিখানা নিয়ে চ'লে গেল।

পরদিন দুপুরের একটু আগেই যুবকটি মঁসিয়ে-ভ্য-বোভাইলের সঙ্গে দেখা করলো। বলা বাহুল্য, তাঁর আফিসেই সে গিয়েছিল।

মেয়রের চিঠি প'ড়ে আর যুবকটির মুখে মোরেল কোম্পানির দেনা কিনে নেবার প্রস্তাব শুনে মঁসিয়ে বোভাইল যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেন। তিনি তখনই বাড়িতে লোক পাঠিয়ে দিলেন দলিলগুলো নিয়ে আসতে। মোরেল কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায়ের আশা তিনি একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। টাকা বড় কম নয়, দু লাথ ফ্রাঁ। দু লাখ ফ্রাঁ ডুবে যাবার কথা চিন্তা ক'রে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। তা ছাড়া তাঁর মেয়ের বিয়েও ঠেকে যাচ্ছিলো টাকার অভাবে। এই সব কারণে যুবকটিকে তিনি ছাড়তে চাইলেন না। তাঁর ইচ্ছা, ঐ দিনই দলিলগুলো হস্তান্তরিত করবেন, কারণ যুবকটি বলেছিল যে সুদ-সহ পুরো টাকা দিয়ে দলিলখানা কিনবার মত নগদ টাকা তার সঙ্গেই আছে।

দলিল আসতে দেরী হচ্ছে দেখে যুবকটি তাঁর সঙ্গে গল্প-গুজব আরম্ভ করলো। কথায় কথায় সে বললো—আচ্ছা, স্যাটু-দ্য-ইফ্ কারাগারের রেকর্ড আপনার এখানে আছে কি?

—নিশ্চয়ই আছে, কেন বলুন তো?

—না, মানে ফারিয়া নামে এক ধর্মযাজকের রেকর্ডটা দেখবার আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে।

—বেশ তো! দেখুন না। আমি এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি, স্যাটু-দ্য-ইফ্ কারাগারের রেকর্ড-বই।

এই ব'লেই একজন আর্দালী ডেকে স্যাটু-দ্য-ইফ্ কারাগারের রেকর্ড-বইখানা নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন তিনি।

আর্দালী বইখানা নিয়ে এলে মঁসিয়ে-দ্য-বোভাইল বললেন—এই নিন স্যাটু-দ্য-ইফ্ কারাগারের রেকর্ড-বই। আপনি ইচ্ছামত দেখুন।

যুবকটি তখন সেই রেকর্ড-বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটা জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেল। সেই পৃষ্ঠার মাথায় লেখা ছিল—

"এডমণ্ড দান্তে, অপরাধ রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র!
নেপোলিয়ানের সঙ্গে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ভূগর্ভস্থ
নির্জন কারাকক্ষে রাখতে হবে একে।"

যুবকটি তাড়াতাড়ি প'ড়ে যেতে লাগলো সেই পৃষ্ঠার যাবতীয় লেখাগুলি। ঐ পৃষ্ঠার সঙ্গে পিন দিয়ে লাগানো কয়েকখানা আল্‌গা কাগজও ছিল। সেই কাগজগুলি প'ড়ে যুবকটি জানতে পারলো যে, মঁসিয়ে মোরেল বহুবার ঐ বন্দীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছেন। নেপোলিয়ান যখন প্যারিসে ফিরে এসেছিলেন, সেই সময় তাঁর কাছে একখানা আবেদনপত্রও পাঠিয়েছিলেন মঁসিয়ে মোরেল, কিন্তু সেখানা কোন অজ্ঞাত কারণে সম্রাটের কাছে পাঠানো হয়নি। সেখানার উপর মঁসিয়ে ভিলেফোর্টের "কিছুই করণীয় নেই" মন্তব্য সহ জেলখানার ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সেই আবেদনপত্র প'ড়ে যুবকটির চোখ দুটি হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো।

এই সময় দলিল নিয়ে মঁসিয়ে-দ্য-বোভাইলের বাড়ি থেকে লোক এসে পড়ায় যুবকটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—দেখা হ'লো আপনার?

যুবকটি তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ ক'রে বললো—হ্যাঁ, হয়েছে। দলিলখানা এসেছে কি?

মঁসিয়ে বোভাইল বললেন—হ্যাঁ, এই যে!

যুবকটি তখন দলিলখানা হাতে নিয়ে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললো—বেশ আপনি লিখে দিন যে, সুদসহ পুরো টাকার বিনিময়ে এই দলিল আপনি রোমের "টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্" কোম্পানিকে হস্তান্তরিত করলেন।

লেখা শেষ হ'লে যুবকটি তার ব্যাগ খুলে নগদ দুই লাখ ছয় হাজার ফ্রাঁর নোট মঁসিয়ে-দ্য-বোভাইলকে গুণে দলিলখানা নিয়ে বিদায় হ'লো।

সতের

সুপ্রসিদ্ধ জাহাজী প্রতিষ্ঠান 'মোরেল এ্যাণ্ড সন'-এর আফিস।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, এখনও বেশ ভাল ভাবেই চলছে এঁদের ব্যবসা, কিন্তু আসলে ঠিক তার উল্টোটি। কোম্পানির পাঁচ-খানা জাহাজের মধ্যে একমাত্র ফারাওঁ জাহাজখানা ছাড়া বাকি চার-খানাই ডুবে গেছে। চারখানা জাহাজ পর পর নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মোরেল কোম্পানির যে বিরাট ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতিপূরণ করতে তাঁদের যাবতীয় রিজার্ভ ফাণ্ড নিঃশেষিত হয়ে যায়।

কিন্তু তাতেও দেনা শোধ হয় না। এখনও কম পক্ষে পাঁচ লাখ ফ্রাঁ দেনা এই কোম্পানির। এই রকম যখন কোম্পানির অবস্থা ঠিক সেই সময় আর এক অভাবনীয় বিপদ্ এসে উপস্থিত হ'লো। কয়েক দিন আগে রোমের 'মেসার্স টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ' কোম্পানি মঁসিয়ে মোরেলকে একখানা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, তারা মোরেল কোম্পানির যাবতীয় দেনা কিনে নিয়েছে। চিঠিতে এ-কথাও তারা লিখেছে যে, কোম্পানির পক্ষ থেকে ৬ই মে তারিখে একজন প্রতিনিধি যাবে তাঁর কাছে—দেনার টাকা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে।

আজ সেই ৬ই মে।

মঁসিয়ে মোরেল চিন্তিতমুখে আফিসে ব'সে আছেন। বেলা তখন প্রায় এগারোটা। এই সময় 'টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্' কোম্পানির প্রতিনিধির কার্ড পেলেন তিনি।

কার্ডখানা হাতে পেয়েই তিনি নিয়ে আসতে বললেন আগন্তুককে। একটু পরেই যে ইংরেজ যুবকটি সেই ঘরে এসে ঢুকলো, তাকে আপনারা এর আগে দু'বার দেখেছেন। একবার মেয়রের ঘরে, আর একবার মঁসিয়ে-দ্য-বোভাইলের আফিসে।

যুবকটি এসেই সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো মঁসিয়ে মোরেলকে।

মঁসিয়ে মোরেল বললেন—বসুন।

যুবকটি বসলে মঁসিয়ে মোরেল আবার বললেন—আপনিই এসেছেন 'টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ' কোম্পানির তরফ থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের যাবতীয় দেনার দলিল আপনারা কিনে নিয়েছেন?

—সেই রকমই আমি শুনেছি।

যুবকের এই কথায় মঁসিয়ে মোরেল ম্লান হেসে বললেন—কিন্তু আমাদের কোম্পানির দেনাগুলো কিনে নেবার কারণটা দয়া ক'রে জানাবেন কি?

—তা আমি ঠিক বলতে পারি না। একথা একমাত্র কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে কবে টাকাগুলো দিতে পারবেন, সেই তারিখটা জেনে নিতে। টাকাগুলো কি আজই দিতে পারবেন? দলিলপত্র আমার সঙ্গেই আছে।

মঁসিয়ে মোরেল ম্লান হেসে বললেন—ধন্যবাদ! কিন্তু আজ আমি টাকা দিতে পারবো না।

যুবকটি আশ্চর্য হয়ে বললো—বলেন কি মঁসিয়ে মোরেল! মোরেল কোম্পানির মত নামকরা প্রতিষ্ঠান দেনার টাকা দিতে দেরি করবে—এ যে বিশ্বাসেরও অযোগ্য!

যুবকের এই কথায় মঁসিয়ে মোরেল হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন—বিশ্বাসের অযোগ্য হ'লেও এ কথা সত্যি। দেনার টাকা শোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার এখন একমাত্র ভরসা—ফারাওঁ জাহাজ। অগস্টের শেষের দিকে জাহাজখানা ফিরে আসবার কথা আছে। জাহাজখানা যদি নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারে, তাহ'লেই আমি দেনা শোধ করতে পারবো, নইলে 'মোরেল এ্যাণ্ড সনে'র নাম জাহাজী প্রতিষ্ঠানসমূহের রেকর্ড থেকে চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে যাবে।

যুবকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো—বেশ, আমি আপনাকে তিন মাসের সময় দিচ্ছি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই তারিখে বেলা

ঠিক এগারোটার সময় আমি আসবো আবার। ঐ দিন যেন আমাকে ফিরে যেতে না হয়, দয়া ক'রে সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

পাওনাদারের কাছ থেকে তিন মাসের সময় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন মঁসিয়ে মোরেল।

তিনি বললেন—কিন্তু এই সময় দেওয়াতে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নিশ্চয়ই ?

যুবকটি হেসে বললো—তা একটু হবে বৈ কি ! কিন্তু আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ ব্যবসায়ীকে বিব্রত করতে আমি চাই না। আপনার সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট খবরাখবর নিয়েছি। আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কিন্তু জেনে রাখুন যে আপনার পাওনাদাররা পর্যন্ত আপনার জন্য দুঃখিত। আচ্ছা, আজ আমি উঠি। সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই তারিখে ঠিক এই সময় আমি আবার আসবো।

যুবকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মঁসিয়ে মোরেল অনুচ্চকণ্ঠে বললেন—নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবো মহান্ যুবক। যদি না পারি তা'হলে আমাকে আর জীবিত দেখবেন না আপনি।

মঁসিয়ে মোরেলের ঘর থেকে বের হ'তেই যুবকটি দেখতে পেলো যে একটি তরুণী চুপ ক'রে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যুবকটি তার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে ব'লে উঠলো —বাবার সঙ্গে আপনার কথাগুলো আমি সব শুনেছি। আপনি আমার এবং আমার মায়ের তরফ থেকে ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

যুবকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটির সামনে। তার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল জুলি ! পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে সে আবার বললো—আপনিই কি মাদ্‌মোয়াসেল জুলি ?

—হ্যাঁ, আমারই নাম জুলি। আপনি আমার নাম জানেন দেখছি !

মেয়েটির কথার সোজা উত্তর না দিয়ে যুবকটি বললো—একদিন 'সিন্দবাদ নাবিক' এই নাম সই-করা একখানা চিঠি আপনি পাবেন। ঐ চিঠির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন আপনি। মনে

যুবকটি বসলে মঁসিয়ে মোরেল আবার বললেন—আপনিই এসেছেন 'টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ' কোম্পানির তরফ থেকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের যাবতীয় দেনার দলিল আপনারা কিনে নিয়েছেন ?

—সেই রকমই আমি শুনেছি।

যুবকের এই কথায় মঁসিয়ে মোরেল ম্লান হেসে বললেন—কিন্তু আমাদের কোম্পানির দেনাগুলো কিনে নেবার কারণটা দয়া ক'রে জানাবেন কি ?

—তা আমি ঠিক বলতে পারি না। একথা একমাত্র কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে কবে টাকাগুলো দিতে পারবেন, সেই তারিখটা জেনে নিতে। টাকাগুলো কি আজই দিতে পারবেন ? দলিলপত্র আমার সঙ্গেই আছে।

মঁসিয়ে মোরেল ম্লান হেসে বললেন—ধন্যবাদ! কিন্তু আজ আমি টাকা দিতে পারবো না।

যুবকটি আশ্চর্য হয়ে বললো—বলেন কি মঁসিয়ে মোরেল! মোরেল কোম্পানির মত নামকরা প্রতিষ্ঠান দেনার টাকা দিতে দেরি করবে—এ যে বিশ্বাসেরও অযোগ্য!

যুবকের এই কথায় মঁসিয়ে মোরেল হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন —বিশ্বাসের অযোগ্য হ'লেও এ কথা সত্যি। দেনার টাকা শোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার এখন একমাত্র ভরসা— ফারাওঁ জাহাজ। অগস্টের শেষের দিকে জাহাজখানা ফিরে আসবার কথা আছে। জাহাজখানা যদি নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারে, তাহ'লেই আমি দেনা শোধ করতে পারবো, নইলে 'মোরেল এ্যাণ্ড সনে'র নাম জাহাজী প্রতিষ্ঠানসমূহের রেকর্ড থেকে চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে যাবে।

যুবকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো—বেশ, আমি আপনাকে তিন মাসের সময় দিচ্ছি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই তারিখে বেলা

ঠিক এগারোটার সময় আমি আসবো আবার। ঐ দিন যেন আমাকে ফিরে যেতে না হয়, দয়া ক'রে সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

পাওনাদারের কাছ থেকে তিন মাসের সময় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন মঁসিয়ে মোরেল।

তিনি বললেন—কিন্তু এই সময় দেওয়াতে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নিশ্চয়ই ?

যুবকটি হেসে বললো—তা একটু হবে বৈ কি! কিন্তু আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ ব্যবসায়ীকে বিব্রত করতে আমি চাই না। আপনার সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট খবরাখবর নিয়েছি। আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না; কিন্তু জেনে রাখুন যে আপনার পাওনাদাররা পর্যন্ত আপনার জন্য দুঃখিত। আচ্ছা, আজ আমি উঠি। সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই তারিখে ঠিক এই সময় আমি আবার আসবো।

যুবকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মঁসিয়ে মোরেল অনুচ্চকণ্ঠে বললেন—নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবো মহান্ যুবক। যদি না পারি তা'হলে আমাকে আর জীবিত দেখবেন না আপনি।

মঁসিয়ে মোরেলের ঘর থেকে বের হ'তেই যুবকটি দেখতে পেলো যে একটি তরুণী চুপ ক'রে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যুবকটি তার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে ব'লে উঠলো—বাবার সঙ্গে আপনার কথাগুলো আমি সব শুনেছি। আপনি আমার এবং আমার মায়ের তরফ থেকে ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

যুবকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটির সামনে। তার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল জুলি! পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে সে আবার বললো—আপনিই কি মাদ্‌মোয়াসেল জুলি ?

—হ্যাঁ, আমারই নাম জুলি। আপনি আমার নাম জানেন দেখছি!

মেয়েটির কথার সোজা উত্তর না দিয়ে যুবকটি বললো—একদিন 'সিন্দবাদ নাবিক' এই নাম সই-করা একখানা চিঠি আপনি পাবেন। ঐ চিঠির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন আপনি। মনে

রাখবেন, আপনার বাবার তাতে উপকার হবে। বলুন করবেন ?

—করবো।

—প্রতিজ্ঞা করছেন ?

—করছি।

—বেশ, আমি তাহ'লে যাচ্ছি। কথাটা দয়া ক'রে গোপন রাখবেন আশা করি।

এই ব'লেই যুবকটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

আঠার

৫ই সেপ্টেম্বর।

সেই যুবকটি বিদায় নিয়ে যাবার পর ঠিক তিন মাস অতীত হয়েছে আজ। এগারোটার সময় আসবার কথা আছে তার।

মঁসিয়ে মোরেলের মনের অবস্থা আজ খুবই খারাপ। সকালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি সবার সঙ্গে ব'সে প্রাতরাশ শেষ করেছেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেছেন শোবার ঘরের দিকে। শোবার ঘরে গিয়ে একটা আলমারি খুলতে গিয়ে দেখতে পেলেন আলমারিটা চাবি বন্ধ। তিনি জুলিকে ডাকেন।

জুলি এলে গম্ভীরভাবে তিনি বললেন—আলমারির চাবিটা দাও তো মা!

—কেন বাবা?

—দরকার আছে।

—কি দরকার আমাকে বলো না!

—তর্ক ক'রো না জুলি। যা বলছি তাই কর।

বাবার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার এর আগে কখন পায়নি জুলি। তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো। চাবিটা বাবার হাতে দিল সে।

চাবিটা হাতে পেয়ে মঁসিয়ে মোরেল বললেন—তুমি এখন তোমার মায়ের কাছে যাও। আমি না ডাকলে এ ঘরে যেন কেউ না আসে।

—আমি তোমার কাছে থাকতে চাই বাবা। আজ আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না! না—না—কিছুতেই যাব না।

মঁসিয়ে মোরেল স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন—ছেলেমানুষী ক'রো না-মা, যাও। তুমি তো আমার কথার অবাধ্য হওনি কোনদিন!

—আগে হইনি, কিন্তু আজ হবো। আমি বুঝতে পারছি, তুমি আজ একটা সাংঘাতিক কিছু করবার মতলব করছো!

এমন সময় সৈনিকের বেশধারী একটি যুবক এসে ঢুকে পড়লো সেই ঘরে।

মঁসিয়ে মোরেল তাকে দেখেই আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠলেন —ম্যাক্সিমিলান!

জুলি বললো—দাদা ! দাদা এসে গেছো ! তাহ'লে আর আমার কোন ভয় নেই। তুমি বাবার কাছে ব'সো দাদা। এখান থেকে এক মিনিটের জন্যও বাইরে যেয়ো না, বুঝলে !

—কি হয়েছে জুলি ? ম্যাক্সিমিলান জিজ্ঞাসা করলো।

—তা ঠিক জানি না দাদা, কিন্তু আজ বাবাকে একলা ছেড়ে যেতে আমার ভয় করছে।

এই ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

জুলি চ'লে যেতেই ম্যাক্সিমিলান জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে বাবা ?

মঁসিয়ে মোরেল তার প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে বললেন—হঠাৎ চ'লে এলে যে ? ছুটি পেয়েছো নাকি ?

—না, ছুটি নিয়ে এসেছি।

—ছুটি নিয়ে এসেছো ! কেন বলো তো ?

—তা ঠিক বলতে পারি না। মায়ের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি আমি। কি হয়েছে বাবা ?

মঁসিয়ে মোরেল গম্ভীর স্বরে বললেন—ব'সো, বলছি।

ম্যাক্সিমিলান বসলে মঁসিয়ে মোরেল বললেন—ফারাওঁ ডুবে গেছে শুনেছো ?

—ফারাওঁ ডুবে গেছে !

—হ্যাঁ বাবা, আজ আমরা সর্বস্বান্ত ! মোরেল এ্যাণ্ড সন্ আজ তাদের দেনার টাকা দিতে অক্ষম।

এই কথা বলবার সময় মঁসিয়ে মোরেলের চোখ দুটি জলে ভ'রে এলো।

ম্যাক্সিমিলান বললো—আমাদের কত টাকা দেনা বাবা ?

—পাঁচ লাখ ফ্রাঁ।

—কত আছে আমাদের ?

—সতের হাজারের বেশী নয়।

—মাত্র ?

—হ্যাঁ বাবা, মাত্র সতের হাজার।

—আর কোথাও কিছু পাওনা নেই ?

—না। আর থাকলেও তা পাওয়া যাবে না।

—আমাদের তো বহুদিনের ব্যবসা। এমন কোন শুভানুধ্যায়ীও কি নেই আমাদের, যাঁর কাছ থেকে ধার পাওয়া যায় ?

ম্যাক্সিমিলানের এই কথায় ম্লান হেসে মঁসিয়ে মোরেল বললেন—ব্যবসার জগতে শুভানুধ্যায়ী ব'লে কোন কথা নেই। এখানে সবাই চায় লাভ—মুনাফা।

এই সময় আফিসের তরুণ ম্যানেজার এমানুয়েল ছুটতে ছুটতে সেই ঘরে এসে বললো—চব্বিশ হাজার ফ্রাঁর একখানা ড্রাফ্‌ট এসেছে এইমাত্র।

মঁসিয়ে মোরেল আশ্চর্য হয়ে বললেন—কি বললে! চব্বিশ হাজার ফ্রাঁর ড্রাফ্‌ট! আচ্ছা, তুমি যাও।

এমানুয়েল চ'লে যেতেই ম্যাক্সিমিলান জিজ্ঞাসা করলো—এমানুয়েলের সঙ্গে জুলির বিয়ের কি হ'ল বাবা ?

—হবে না।

—হবে না!

—না। একজন দেউলে'র মেয়েকে কে বিয়ে করবে ?

—দেউলে'র মেয়ে ?

—হ্যাঁ ম্যাক্সিমিলান, দেউলে'র মেয়ে। তোমার বাবা আজ দেউলে, ফাঁকিবাজ, পাওনাদারদের দেনা মেটাতে অক্ষম।

এই পর্যন্ত ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন—এ অবস্থায় আমার কি কর্তব্য বলতে পারো ?

ম্যাক্সিমিলানের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

এই সময় ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দ হ'লো।

মঁসিয়ে মোরেল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—আর এক ঘণ্টা পরে টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্‌ কোম্পানির প্রতিনিধি আসবে আমার কাছে!

ওরা আমার কাছে পাঁচ লাখ ফ্রাঁ পায়। যে প্রতিনিধি আসবে, তার মত ভদ্র যুবক আমি খুব কমই দেখেছি। আজ থেকে ঠিক তিন মাস আগে সে আমার কাছে এসেছিল। আমি তখন বলেছিলাম যে 'ফারাওঁ' ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি টাকা দিতে অক্ষম। এই কথা শুনে যুবক নিজের দায়িত্বে আমাকে তিন মাসের সময় দিয়ে গিয়েছিল। আজ বেলা এগারোটায় সেই তিন মাস উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ঠিক এগারোটায় সে আসবে টাকা নিতে।

—তাকে কি বলা হবে বাবা ?

—কিছুই বলা হবে না। রক্ত দিয়ে অক্ষমতার অসম্মানকে ধুয়ে দেব। আমি আত্মহত্যা করবো।

—আত্মহত্যা করবে ?

—হ্যাঁ ম্যাক্সিমিলান। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। জোচ্চোর নাম নিয়ে বেঁচে থাকতে আমি চাই না। তুমি সৈনিক, আশা করি আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পারছো।

মঁসিয়ে মোরেলের এই কথায় ম্যাক্সিমিলান একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল। তার মুখ থেকে কোন কথাই বের হ'লো না।

মঁসিয়ে মোরেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন আলমারির দিকে।

আলমারি খুলে একটা পিস্তল বের ক'রে সেটাকে খুলে পরীক্ষা করলেন। হয়তো পিস্তলে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিলেন। তারপর আবার সেটাকে বন্ধ ক'রে পকেটে ফেলে যেমন ধীরে ধীরে গিয়েছিলেন ঠিক সেই রকম ধীরে ধীরেই ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—এইবার আমাকে আফিস ঘরে যেতে হবে। অনেক কাজ শেষ ক'রে যেতে হবে মরবার আগে!

—আমি কি তোমার সঙ্গে আসতে পারি বাবা ?

—ইচ্ছা করলে আসতে পার। আমি জানি তুমি আমাকে বাধা দেবে না।

এই বলেই মঁসিয়ে মোরেল দরজার দিকে চলতে লাগলেন। ম্যাক্সিমিলানও চলতে লাগলো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

* * * *

ম্যাক্সিমিলানকে বাবার কাছে রেখে জুলি সেই ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ির সামনে আসতেই বাড়ির একটা চাকর একখানা খামে ভর্তি চিঠি তার হাতে দিয়ে বললো—আপনার চিঠি।

—আমার চিঠি! কে দিয়েছে?

—তা জানি না, একজন লোক এইমাত্র চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললো—এক্ষুণি চিঠিখানা মাদ্‌মোয়াসেল জুলির হাতে দিয়ে এসো।

জুলি খামখানা ছিঁড়ে চিঠি বের ক'রে পড়তে লাগলো। চিঠিতে লেখা ছিল :—

> "এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এলিজ-দ্য-মিলানে চ'লে যান। ওখানে ১৫ নং বাড়ির চারতলার দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটে যাবেন আপনি। দরজার সামনে একজন দরোয়ানকে দেখতে পাবেন। তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকবেন। ঘরের এক কোণে একখানি রুমালে বাঁধা কিছু জিনিস দেখতে পাবেন। রুমালখানা নিয়ে এসে আপনার বাবার হাতে দেবেন। আপনি একা যাবেন। আপনার সঙ্গে অন্য কোন লোক থাকলে দরোয়ান আপনাকে চাবি দেবে না। স্মরণ রাখবেন, রুমালখানা বেলা এগারোটার আগেই আপনার বাবার হাতে আসা দরকার। আপনি আমার কথা রাখবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। প্রতিজ্ঞাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ইতি—
>
> সিন্দ্‌বাদ নাবিক।"

চিঠিখানা প'ড়ে জুলি কি করবে ঠিক ক'রে উঠতে পারলো না প্রথমটায়। একবার তার মনে হ'লো—হয়তো কোন দুষ্ট লোক তাকে বিপদে ফেলবার জন্য এই রকম ফাঁদ পেতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'লো সেদিনের কথা। সেই যুবকটির কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, 'সিন্দ্‌বাদ নাবিক' সই-করা চিঠির নির্দেশমত কাজ করবে সে।

এই সব কথা যখন সে চিন্তা করছে এই সময় এমান্নুয়েলকে দেখতে পেলো সে। এমান্নুয়েল তার বাবার ঘরের দিকে ছুটছিল। তাকে সিঁড়ির কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এমান্নুয়েল বললো—তুমি একটু দাঁড়াও লক্ষ্মীটি, আমি এক্ষুণি আসছি। এই ব'লে সে মঁসিয়ে মোরেলের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মঁসিয়ে মোরেলের ঘর থেকে ফিরে এলো এমান্নুয়েল। জুলির হাতের চিঠিখানা দেখে সে বললো—কার চিঠি ওখানা ?

জুলি চিঠিখানা এমান্নুয়েলের হাতে দিয়ে বললো—প'ড়ে দেখ।

চিঠিখানা প'ড়ে এমান্নুয়েল বললো—বেশ তো! চলো না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

জুলি বললো—কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে দরোয়ান চাবি দেবে না, সে কথা পড়েছো তো ?

—তাতে কি হয়েছে ? তুমি একাই যেও। আমি তোমার জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করবো। যদি তোমার দেরি দেখি তখন আমি যাব।

ব্যবস্থাটা জুলির ভালই মনে হ'লো। ওরা তখন আর দেরি না ক'রে ছুটলো এলিজ-দ্য-মিলানের দিকে।

* * * *

এগারোটা বাজতে পাঁচ। মঁসিয়ে মোরেল আর ম্যাক্সিমিলান মুখোমুখি অবস্থায় টেবিলের দুই দিকে ব'সে।

একজন আরদালী এসে খবর দিল—টম্সন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্ কোম্পানি থেকে একজন লোক এসেছে হুজুর।

মঁসিয়ে মোরেল বললেন—আচ্ছা তুমি যাও। দশ মিনিট পরে পাঠিয়ে দিও তাঁকে।

আরদালী চ'লে যেতেই পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলেন মঁসিয়ে মোরেল।

ম্যাক্সিমিলানের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার মা আর জুলিকে তুমি……

…বাবা ! বাবা !! বাবা !!!

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে জুলি এসে ঢুকলো সেই ঘরে।

মঁসিয়ে মোরেলের হাতে তখন গুলি-ভরা পিস্তল।

জুলি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো—বাবা ! আমরা রক্ষা পেয়ে গেছি ! আমাদের কোম্পানির আর কোন দেনা নেই।

—আমরা রক্ষা পেয়ে গেছি ! কোম্পানি রক্ষা পেয়ে গেছে ! কি বলছো জুলি !

—ঠিকই বলছি বাবা। এই ছাখো !

এই ব'লে সে রুমালে বাঁধা একটা ছোট পোঁটলা মঁসিয়ে মোরেলের হাতে দিল।

মঁসিয়ে মোরেল রুমালখানা খুলতেই দেখলেন যে, তার মধ্যে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ।

কাগজখানার ভাঁজ খুলতেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্ কোম্পানি তাদের সম্পূর্ণ টাকা বুঝে পেয়ে রসিদ লিখে দিয়েছে। কাগজখানা সেই রসিদ।

রুমালের আর এক কোণে কি একটা জিনিস বাঁধা ছিল। মঁসিয়ে মোরেল কম্পিতহস্তে সে দিকটা খুলতেই দেখতে পেলেন, তার মধ্যে রয়েছে একখানা মহামূল্য হীরে আর একখানা ছোট কাগজ। কাগজখানায় লেখা—

"জুলির বিয়েতে যৌতুক।"

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলেন না মঁসিয়ে মোরেল। কেবল রুমালখানা দেখে তাঁর যেন মনে পড়তে লাগল যে, ওখানা একদিন তাঁরই ছিল।

কিছুই বুঝতে না পেরে জুলির দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—একি ব্যাপার জুলি ? এ তুমি কোথায় পেলে ?

জুলি তখন সিন্দ্‌বাদ নাবিকের লেখা সেই চিঠিখানা বাবার হাতে দিয়ে বললো—এই চিঠির নির্দিষ্ট স্থানে।

চিঠিখানা প'ড়ে মঁসিয়ে মোরেল বললেন—তুমি কি একা গিয়েছিলে সেখানে ?

—না। এমান্যুয়েল আমার সঙ্গে ছিল। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল।

ঠিক সেই সময় আফিসের হেড-ক্লার্ক হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে পড়লো সেই ঘরে।

সে এসেই বললো—ফারাওঁ! ফারাওঁ ফিরে আসছে মঁসিয়ে!

—কি বললে! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি ?

—না মঁসিয়ে। পোর্ট আফিস থেকে খবর পেলাম, ফারাওঁ ফিরে আসছে। এই দেখুন পোর্ট আফিসের চিঠি।

"একি আশ্চর্য কাণ্ড। যে জাহাজ ডুবে গেছে, যার নাবিকদের উদ্ধার ক'রে এনেছে অন্য এক জাহাজ, সেখানা কি ক'রে ফিরে আসছে আবার!"

মঁসিয়ে মোরেলের বিশ্বাস হয় না এই অসম্ভব কথা। কিন্তু বিশ্বাস না হ'লেও তিনি চললেন বন্দরের দিকে। তাঁর সঙ্গে চললো ম্যাক্সিমিলান, জুলি, মাদাম মোরেল আর এমান্যুয়েল। মোরেল কোম্পানির আফিসের কর্মচারীরাও চললেন এই অভাবনীয় খবর শুনে।

বন্দরে ঢুকতেই ওঁরা দেখলেন যে ইতোমধ্যেই বন্দর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ডুবে-যাওয়া জাহাজ আবার ফিরে আসছে—এই অসম্ভব কথা শুনে মার্সেঈ-এর আবালবৃদ্ধবনিতা ভেঙে পড়েছে বন্দরে।

মঁসিয়ে মোরেল সপরিবারে বন্দরের ধারে এসে দাঁড়াতেই দেখা গেল একখানা জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। জাহাজের মাথায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—"ফা রা ওঁ"!

সবাই উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলো—ফারাওঁ! ফারাওঁ! ফারাওঁ ফিরে আসছে!

মঁসিয়ে মোরেল যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। এ কি অসম্ভব কাণ্ড!

জাহাজখানি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো জেটির দিকে।

কাপ্তেন দাঁড়িয়ে আছে ডেকের উপরে।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠলো—"জ্যাকোপো! জ্যাকোপো! আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নাও বন্ধু।"

কাপ্তেন হাসিমুখে হাত উঠিয়ে অভিনন্দন জানালো সেই অদৃশ্য বক্তার উদ্দেশে। কিন্তু কে সেই বক্তা তা কেউ জানতে পারলো না।

বক্তা তখন লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল মঁসিয়ে মোরেলের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে বললো—বিদায় মঁসিয়ে মোরেল! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি সুখী হোন। এই ব'লে একটু থেমে সে মনে মনে আবার বললো—সজ্জনদের প্রতি আমার কর্তব্য এখানেই শেষ! এর পর থেকেই আরম্ভ হবে দুর্জনের বিরুদ্ধে আমার অভিযান। ফার্নান্দ্! ড্যাংলার! ভিলেফোর্ট! তোমাদের দর্প চূর্ণ করতে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করবো। তোমাদের ধ্বংসই আজ থেকে আমার সংকল্প।

উনিশ

মার্সেঈ-এর সেই ঘটনার কয়েক বছর পরের কথা। প্যারিস সহরে তখন কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টো নামে একজন লোক রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর চাল-চলন আর রাজা-বাদশার মত খরচের বহর দেখে সারা প্যারিস বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছে।

প্যারিসের অভিজাত সমাজের প্রত্যেকের মুখেই তখন কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টোর নাম। অভিজাত মহলের প্রত্যেকটি প্রীতিভোজেই হয় কাউণ্টের নিমন্ত্রণ।

সেদিন মারকাফ প্রাসাদে এমনি এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন ভাইকাউণ্ট আলবার্ট-দ্য-মারকার্ফ। বলা বাহুল্য কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টোও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেই প্রীতিভোজে।

কাউণ্ট আসতেই আলবার্ট তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

কাউণ্ট বললেন—দেরি ক'রে আসার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন ভাইকাউণ্ট। পনের শ' মাইল দূর থেকে আসতে হয়েছে ব'লেই ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারিনি আমি।

আলবার্ট আশ্চর্য হয়ে বললেন—দেরি! কৈ, দেরি তো হয়নি! সাড়ে দশটায় আসবার কথা ছিল আপনার, এখন তো দশটা একত্রিশও হয়নি।

কাউণ্ট হেসে বললেন—কয়েক সেকেণ্ড দেরিকেও আমি দেরি ব'লেই মনে করি।

আলবার্ট তখন কাউণ্টকে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়ে বললেন—তাহ'লে আর বিলম্ব করে লাভ কি? আসুন, খেতে বসা যাক।

ভোজ টেবিল।

নানারকম রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য আর ফরাসী দেশের বিখ্যাত মদ পরিবেশন করা হয়েছিল নিমন্ত্রিতদের।

খেতে খেতে গল্প চলতে লাগলো। কথায় কথায় কাউন্ট বললেন —আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণে কবে আসছি বলুন!

আলবার্ট হেসে বললেন—আরও কিছুদিন দেরি আছে ও ব্যাপারে, তবে আমার ভাবী বধূ ইউজিনি আর তাঁর পিতা ব্যারন ড্যাংলার-এর সঙ্গে আজই আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো আশা করছি। তাঁদের আজ আসবার কথা আছে আমাদের বাড়িতে।

—ব্যারন ড্যাংলার! ব্যাঙ্কার কি তিনি?

—হ্যাঁ, তিনি এখন প্যারিসের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের মালিক। আপনি চেনেন নাকি তাঁকে?

—না, ঠিক চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তবে তাঁর ব্যাঙ্কের উপরেই লেটার-অব গ্যারান্টি দিয়েছে আমার রোমের ব্যাঙ্কার মেসার্স টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্। কিন্তু মঁসিয়ে ড্যাংলার ব্যারন হয়েছেন, তা আমি জানতাম না।

—না জানবারই কথা, কারণ ইনি খুব অল্প দিন হ'লো ব্যারন উপাধি পেয়েছেন।

—দেশ সেবার পুরস্কার বুঝি?

—অনেকটা তাই! আমাদের সরকার যখন টাকার অভাবে দেউলে হবার মত হয়েছিল সেই সময় মঁসিয়ে ড্যাংলার ষাট লাখ ফ্রাঁ ধার দেন সরকারকে।

এই সময় কাউন্ট হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা ক'রে ব্যারন ড্যাংলারের প্রসঙ্গ চাপা দেন।

এর পর আরও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো সেই ভোজসভায়। নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়রা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন কাউন্টের জ্ঞানের গভীরতা দেখে। তিনি যেন জীবন্ত একখানি বিশ্বকোষ। এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে পারেন না।

গল্প-গুজবের মধ্যে ভোজপর্ব শেষ হ'লো। এর পর এলো বিদায় নেবার পালা। কাউন্টকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্যে আলবার্ট

যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, ঠিক সেই সময় একখানি সুদৃশ্য ল্যাণ্ডো এসে থামলো সেই বাড়ির ফটকে। কাউন্ট লক্ষ্য করলেন যে, ঐ গাড়ির ঘোড়ার মত সুন্দর ও আশ্চর্য রঙের ঘোড়া সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। ঘোড়াটির গায়ে জেব্রার মত ডোরা কাটা।

কাউন্ট বললেন—বাঃ! চমৎকার ঘোড়াটা তো!

আলবার্ট হেসে উত্তর দিলেন—ব্যারন ড্যাংলারের ঘোড়া। এই ব'লেই তিনি এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে এলেন ব্যারন ও ব্যারনেস্ ড্যাংলার, আর তাঁদের পিছনে মাদ্‌মোয়াসেল ইউজিনি।

আলবার্ট তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কাউণ্টের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কাউন্ট সসম্মানে ব্যারনেস্ ড্যাংলারের সামনে মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি ব্যারনেস্!

ব্যারনেস্ তখন স্মিত হাস্যে করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে।

এর পর ইউজিনির সঙ্গে করমর্দন ক'রে কাউন্ট এগিয়ে গেলেন ব্যারন ড্যাংলারের কাছে। সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে করমর্দন ক'রে কাউন্ট বললেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলাম ব্যারন। আশা করি আমাদের এই পরিচয় শীঘ্রই আরও ঘনিষ্ঠ হবে।

ব্যারন ড্যাংলার বললেন—আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি কাউন্ট। আজ ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।

কাউন্ট বললেন—আমিও খুশী হয়েছি আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত-ভাবে পরিচিত হয়ে। আমার খুশী হবার আরও কারণ এই যে, আপনার ব্যাঙ্কের উপরই 'লেটার অব গ্যারান্টি' পাঠিয়েছেন আমার রোমের ব্যাঙ্কার মেসার্স টমসন এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্।

এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'লো। তারপর কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো বিদায় নিলেন।

* * * *

পরদিন সকালে একজন সুবেশ ভদ্রলোক এসে দেখা করলেন ব্যারন ড্যাংলারের সঙ্গে। কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর সেই ভদ্রলোক একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসলেন।

তিনি বললেন—আপনার ঘোড়াটা যদি বিক্রি করেন, তাহ'লে আমি খুব ভাল দামে বিক্রি করিয়ে দিতে পারি।

ব্যারন মহা বিরক্ত হয়ে বললেন—আমি ঘোড়া বিক্রি করবো, একথা কে বলেছে আপনাকে ?

—না, কেউ বলেনি, তবে আমি যাঁর কাছ থেকে এসেছি তিনি চান আপনার ঐ ঘোড়ার মত একটা ঘোড়া। তাতে যত দামই লাগে।

ব্যারন তখন কৌতুক করবার জন্য বললেন—ধরুন যদি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দাম চাই আমি !

—আমি এখনই দিতে প্রস্তুত আছি ব্যারন। টাকা আমার সঙ্গেই আছে।

ব্যারন আশ্চর্য হয়ে গেলেন আগন্তুকের কথা শুনে। ভাবলেন—বলে কি লোকটা ! পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে একটা ঘোড়া কিনতে চায় ! পাগল নাকি ?

ব্যারনকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—অত ভাবছেন কি ব্যারন ? আপনি রাজী থাকলে আমি এখনই পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিতে পারি আপনাকে।

এই ব'লে সত্যি সত্যিই ভদ্রলোক পকেট থেকে একগাদা ব্যাঙ্ক নোট বের ক'রে টেবিলের উপর রাখলেন !

নোটগুলো দেখে লোভে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ব্যারনের চোখ। তিনি বললেন—বেশ ! আমি রাজী আছি। আপনি কি আজই নিয়ে যেতে চান ঘোড়াটাকে ?

ভদ্রলোক বললেন—আজই নয়, এখনই।

ব্যারন ড্যাংলার তখন পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর নোট গুনে নিয়ে রসিদ লিখে দিলেন ভদ্রলোককে।

একটু পরেই ব্যারনের ঘোড়াটা নিয়ে চ'লে গেলেন তিনি।

* * * *

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টোর গাড়িখানা এসে ব্যারন ড্যাংলারের বাড়ির দরজায় থামলো। ব্যারন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, কাউন্টের গাড়ি টানছে তাঁর সেই ঘোড়া!

কাউন্ট গাড়ি থেকে নেমে সোজা ব্যারনের বসবার ঘরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ব্যারন বললেন—আসুন কাউন্ট! আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি আমি।

কাউন্ট হেসে বললেন—হ্যাঁ, বৈষয়িক ব্যাপারগুলো সেরে ফেলবার জন্য আজ আসবো ব'লে খবর পাঠিয়েছিলাম। তা, কাগজ-পত্রগুলো কি এখানেই দেখাবো, না আপনার ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবো?

—ওগুলো কি আপনার সঙ্গে আছে?

—হ্যাঁ, সঙ্গে নিয়েই এসেছি আমি।

—বেশ, দিন তাহ'লে, এখানেই দেখে নিই।

কাউন্ট তখন 'টমসন এণ্ড ফ্রেঞ্চ্' কোম্পানির দেওয়া 'লেটার অব গ্যারান্টি'খানা বের ক'রে ব্যারন ড্যাংলারের হাতে দিলেন।

কাগজখানা প'ড়ে ব্যারনের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো।

তিনি বললেন—এতে বোধ হয় একটু ভুল আছে। টাকার অঙ্ক লেখা নেই দেখছি।

কাউন্ট বললেন—ভুল আছে! কৈ দেখি!

এই ব'লে কাগজখানা ব্যারনের হাত থেকে নিয়ে তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন—না, ভুল তো নেই।

—সে কি! এতে তো দেখছি লেখা আছে অপরিমিত টাকার ক্রেডিট্ আপনাকে দিতে। এরকম "লেটার অব গ্যারান্টি" তো এর আগে আর কখনও দেখিনি।

কাউন্ট হাসতে হাসতে বললেন—তাহ'লে আমি কি মনে করবো যে 'টমসম এ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ্' কোম্পানির এই গ্যারান্টিপত্র আপনি বিশ্বাস করছেন না, অথবা আমার প্রয়োজনীয় টাকা দেবার ক্ষমতা আপনার নেই?

কাউণ্টের এই কথায় ব্যারন ড্যাংলারের মুখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—আমার আর্থিক ক্ষমতার কথাই যখন তুললেন, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনার হিসাব আমার ব্যাঙ্কে খুলবো। বলুন, কত টাকা দরকার হবে আপনার? দশ লাখ ফ্রাঁ!

—দশ লাখ ফ্রাঁ। কাউণ্ট হেসে বললেন—দশ লাখ ফ্রাঁ তো আমার পকেটেই থাকে সব সময়। ঐ সামান্য টাকার জন্য আপনার ব্যাঙ্কে হিসাব খুলবার দরকারই হ'তো না।

এই ব'লেই কাউণ্ট পকেট থেকে একটা মরক্কো চামড়ার সুদৃশ্য নোটকেস বের ক'রে তা থেকে প্রায় পনের লাখ ফ্রাঁর নোট বের ক'রে ব্যারন ড্যাংলারের টেবিলের উপরে রাখলেন।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ব্যারন ড্যাংলার আমতা আমতা ক'রে বললেন—বেশ। তাহ'লে কত টাকা আপনার দরকার বলুন?

কাউণ্ট মনে মনে হিসেব ক'রে বললেন—তা ধরুন ষাট লাখ ফ্রাঁ তো বটেই।

ব্যারন বললেন—বেশ। ষাট লাখ ফ্রাঁ'ই আপনি পাবেন। ব্যাঙ্কে গিয়ে লেখাপড়াটা সেরে আসবেন সময়মত।

ব্যারন ড্যাংলারের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ব্যারনেস্ ড্যাংলার ঝড়ের মত বেগে সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কৈফিয়ৎ চাইবার সুরে ব্যারনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আমার ঘোড়া অন্যের গাড়িতে দেখছি কেন? তুমি কি ওটা বিক্রি করেছো নাকি?

এই সময় কাউণ্ট দাঁড়িয়ে উঠে ব্যারনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি তাহ'লে আসি ব্যারন। সময়মত ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা করবো আপনার সঙ্গে।

এই কথা ব'লেই কাউণ্ট বেরিয়ে গেলেন সেই ঘর থেকে।

* * * *

ঘণ্টা দুই পরের কথা।

একজন পত্রবাহক ব্যারনেস্ ড্যাংলারের নামে একখানা চিঠি নিয়ে এলো।

চিঠিখানি খুলে ব্যারনেস পড়লেন—

মাননীয়াসু—

আপনার ঘোড়াটি আমি অজ্ঞাতসারে কিনে ফেলেছিলাম ব'লে দুঃখিত। পত্রবাহকের সঙ্গে ঘোড়াটি ফেরত পাঠালাম। এর দাম আপনাকে দিতে হবে না। এটা আমার উপহার ব'লে মনে করলে খুশী হবো। ইতি—

কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো

চিঠিখানা প'ড়ে অবাক হয়ে গেলেন ব্যারনেস্। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর দাবী এক কথায় যে লোক ছেড়ে দিতে পারে, তাঁর টাকার পরিমাণ কত?

কুড়ি

কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টোর কার্যধারার কিছুটা বিশ্লেষণ করা দরকার হয়ে পড়েছে। আগের পরিচ্ছেদে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, কাউন্ট প্যারীতে এসে ভাইকাউন্ট আলবার্টের প্রীতিভোজে যোগদান করেছেন এবং ব্যারন ড্যাংলারের ব্যাঙ্কে হিসাব খুলবার উদ্দেশ্যে অপরিমিত টাকার 'লেটার অব গ্যারান্টি' দাখিল করেছেন। তা'ছাড়া ব্যারনেস্ ড্যাংলারের ঘোড়াটা বহু টাকায় কিনে নিয়ে আবার তাঁকেই উপহার দিয়েছেন।

এ সবের উদ্দেশ্য কী?

উদ্দেশ্য একটা অবশ্যই আছে, আর সেটি হচ্ছে প্রতিহিংসা। কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো ওরফে এডমণ্ড দান্তে খুব ভাল ক'রেই তাঁর শত্রুদের সম্বন্ধে খবরাখবর নিয়েছেন। ড্যাংলার, ফার্নান্দ্ ও ভিলেফোর্ট সম্বন্ধে খবরাখবর নিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন যে, ওরা তিনজনেই এখন প্যারীর অভিজাত সমাজে বিখ্যাত লোক ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জেলের ছেলে ফার্নান্দ্ এখন কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফ আর জাহাজের কেরানী ড্যাংলার হয়েছে ব্যারন ড্যাংলার।

ফার্নান্দের সম্বন্ধে আরও যে সব খবর তিনি জানতে পেরেছেন, সেগুলি অত্যন্ত মারাত্মক! তিনি খবর পেয়েছেন যে, প্যারীতে আসবার আগে সে জেনিনায় আলী পাশার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। তিনি আরও খবর পান যে, আলী পাশার মৃত্যুটাকে জেনিনার লোকেরা গুপ্তহত্যা ব'লে মনে করে।

আলী পাশার দুর্গ রক্ষার ভার ছিল ফার্নান্দের উপরে। পাশার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাও ঐ দুর্গেই ছিলেন তখন। কিন্তু আলী পাশার মৃত্যুর পর রহস্যজনকভাবে ঐ দুর্গটি শত্রুদের করায়ত্ত হয় এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

এই সব খবর জোগাড় করবার পরই কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো প্যারীতে চ'লে আসেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে থাকে প্রতিহিংসার আগুন। কিন্তু সে আগুন তিনি হাবভাবে বা চালচলনে একেবারেই প্রকাশ পেতে না দিয়ে স্থির মস্তিষ্কে

বৈরনির্যাতনের কাজে লেগে যান। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, মার্সেদেস তখন ঐ ফার্নান্দ ওরফে কাউন্ট-দ্য মারকার্ফ-এর স্ত্রী, আর ভাইকাউন্ট আলবার্ট তার ছেলে। আলবার্টের সঙ্গে ড্যাংলারের মেয়ে ইউজিনির বিয়ের সম্বন্ধের কথাও জানতে পান তিনি। এখানে আরও একটা কথা ব'লে রাখা দরকার যে, কাউন্ট আলী পাশার স্ত্রী-কন্যার খোঁজে জেনিনাতেও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কতকগুলো গোপন খবর যোগাড় ক'রে তিনি দস্যু-দলপতি লুইগি ভাম্পার সঙ্গে দেখা করেন। তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে এসেছেন। লুইগি ভাম্পার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় 'এমেলিয়া' জাহাজের কাপ্তেনের মধ্যস্থতায়। লুইগি ভাম্পার সঙ্গে তিনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন বা কি কাজ করেছিলেন, সে সব কথা প্যারীর লোকেরা কিছুই জানতো না। তারা শুধু জানতো যে প্যারী শহরে কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো নামে একজন অসাধারণ লোকের আবির্ভাব হয়েছে—যে লোক ইচ্ছা করলে গোটা ফরাসী দেশটাই কিনে নিতে পারে।

প্যারীতে যে বাড়িখানা তিনি কিনেছিলেন, সেখানাকে লোকে আগে ভূতের বাড়ি বলতো। কিন্তু ঐ ভূতের বাড়িকেই তিনি যেন আলাদীনের দৈত্যের সাহায্যে রাজপ্রাসাদে পরিণত ক'রে ফেলেছেন।

আমরা যেদিনের কথা বলছি, সেদিন ঐ বাড়িতে এক ইটালিয়ান মেজরের শুভাগমন হয়েছিল। মেজর মহাশয়ের নাম বার্তোলোমিও ক্যাভালকান্টি। ভদ্রলোক কাদার বুসেনি নামে এক ধর্মযাজকের কাছ থেকে একখানা পরিচয়পত্র নিয়ে কাউন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

কাউন্টের সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন মেজর সাহেবকে। তিনি বললেন—স্বাগতম্ মেজর ক্যাভালকান্টি, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

—সে কি! আমি যে আজ আসবো, সে খবর তো আপনাকে আগে জানাইনি!

—আপনি না জানালেও আমি তা জানতে পেরেছি। ফাদার বুসেনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে সব কথাই বলেছেন। আপনি তো অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর ?

—মেজর! তা হবে।

—তা ছাড়া আপনিই তো ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত ক্যাভালকাণ্টি বংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী···অর্থাৎ ক্যাভালকাণ্টি পরিবারের অতুল ঐশ্বর্যের মালিক, কেমন সত্যি কি না ?

—এসব কথাও বুঝি ফাদার বুসেনি বলেছেন ?

—তা ছাড়া আর কে বলবে ? যাই হোক, আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান আমার কাছ থেকেই পাবেন, তা ছাড়া ফাদার বুসেনির নির্দেশমত পাঁচ হাজার ফ্রাঁও আমি আজই দিয়ে দেব আপনাকে। সে যাই হোক, আপনার হাতে ফাদার বুসেনি কোন চিঠিপত্র দিয়েছেন কি ?

মেজর ক্যাভালকাণ্টি বললেন—হ্যাঁ, দিয়েছেন।

এই ব'লে পকেট থেকে একখানা খামে বন্ধ চিঠি বের ক'রে কাউন্টের হাতে দিয়ে বললেন—এই যে!

চিঠিখানা গভীর মনোযোগ সহকারে প'ড়ে কাউণ্ট বললেন—ফাদার বুসেনি টাকার বিষয়ে কিছু বলেছেন কি আপনাকে ?

কাউন্টের এই কথায় মেজর মহোদয় যেন বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন—হ্যাঁ, মানে ফাদার আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নাকি আপনার কাছে···

—কি বলেছিলেন বলুন!

—বলেছিলেন যে তিনি নাকি আপনার কাছে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ পান।

—হ্যাঁ, ঐ টাকা তিনি আপনাকে দিতে বলেছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি চেক্ দিয়ে দিচ্ছি। আর ইতিমধ্যে আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ছেলের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। সে পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে।

—আমার ছেলে ! মানে···

—হ্যাঁ, আপনার নিরুদ্দিষ্ট ছেলে এণ্ড্রি ক্যাভালকান্টি। আমি সব খবরই শুনেছি ফাদার বুসেনির কাছে। আপনি যে গোপনে অলিভা কার্সিনারী নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, সেই সার্টিফিকেট আর সারাজেভোর মিউনিসিপ্যাল অফিসে আপনার ছেলে এণ্ড্রির জন্ম রেজিষ্ট্রীর সার্টিফিকেটও আমার কাছে আছে, এই নিন।

এই ব'লে কাউন্ট পকেট থেকে একখানা লম্বা খাম বের ক'রে মেজর ক্যাভালকান্টির হাতে দিলেন।

মেজর ক্যাভালকান্টি তখন খামখানা খুলে তার ভিতর থেকে সেই সার্টিফিকেট দু'খানা বের ক'রে প'ড়ে দেখতে লাগলেন।

কাউন্ট বললেন—কেমন, ঠিক আছে তো ?

—ঠিক আছে ব'লেই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু······

—আর কোন কিন্তু নয় মেজর ! আপনি আপনার হারানো ছেলে আর সঙ্গে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ আজই পাবেন। এরপর আপনি প্যারীতে আপনার সামাজিক পদগৌরব নিয়ে বাস করবেন। আপনাদের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, তার জন্য একখানা বাড়িও ভাড়া করে রেখেছি আপনার জন্য। এইবার যান ; আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে।

—তা যাচ্ছি, কিন্তু···

—কিন্তু কি আবার ?

—মানে—ঐ টাকাটা······

—ও, আচ্ছা দাঁড়ান, টাকাটা এখনই দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। এই ব'লে পকেট থেকে চেক বই বের ক'রে ড্যাংলার কোম্পানির ব্যাঙ্কের উপরে পঁয়তাল্লিশ হাজার ফ্রাঁর একখানা চেক কেটে মেজর ক্যাভালকান্টির হাতে দিলেন কাউন্ট।

চেকখানা হাতে পেয়ে মেজর বললেন—আমি তাহ'লে······

—হ্যাঁ। ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবার।



কাউণ্ট বললেন—তাহলে আসুন, এই ঘরের পিছনে যে গোপন সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি দিয়েই......

মেজর ক্যাভালকান্টি পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই কাউন্ট আবার তাঁকে ডাকলেন—হ্যাঁ শুনুন।

তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে মেজর বললেন—কি বলছেন কাউন্ট?

—আপনি আপনার ব্যাঙ্কের হিসাব ড্যাংলার কোম্পানির ব্যাঙ্কেই খুলবেন।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মেজর ক্যাভালকান্টি পাশের ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

তিনি চ'লে যেতেই কাউন্টের ঠোঁটের কোণে যেন একটু দুষ্ট হাসি খেলে গেল বলে মনে হ'লো।

* * * *

মেজর ক্যাভালকান্টি পাশের ঘরে ঢুকতেই একটি বিশ একুশ বছরের ছেলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। মেজর ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে চললেন।

ছেলেটি বললো—আপনি!

—আমার নাম মেজর ক্যাভালকান্টি। বার্তোলোমিও ক্যাভালকান্টি।

—বাবা!

ছেলেটির মুখে 'বাবা' ডাক শুনবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মেজর দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এণ্ড্রি, বাপ আমার! এতদিন পরে তোমাকে তাহলে সত্যিই ফিরে পেলাম আমি!

এণ্ড্রি, এগিয়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধ'রে বললো—বাবা, আজ যে আমার কী সুখের দিন, তা ভাষায় বলা সম্ভব নয়।

এই পর্যন্ত ব'লেই বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে সে আবার বললো—কিন্তু কেবলকান্ত মহাশয়! আমার বাবা সাজবার জন্য তুমি কত পেয়েছো বলো দিকিনি?

পুত্রের কথায় মেজর ক্যাভালকান্টি হঠাৎ তড়িতাহতের মত চমকে উঠে বললেন—এ তুমি কি বলছ এণ্ড্রি?

—ঠিকই বলছি বাবা মশাই। আমিও তোমারই মত এখানে

আমদানি হয়েছি। মোটা টাকা পেয়েছি তোমার ছেলে সাজবার জন্য।

এই সময় কাউণ্ট অব মন্টিক্রিষ্টোকে ঘরে ঢুকতে দেখে মেজর সাহেব ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন—চুপ! কাউণ্ট আসছে।

পিতা-পুত্রের এই মিলন দৃশ্য দেখে খুশী হয়ে কাউণ্ট বললেন—তাহ'লে এণ্ড্রি! পিতাকে ফিরে পেয়ে খুশী হয়েছো নিশ্চয়ই?

এণ্ড্রি বললো—খুশী ব'লে খুশী, এরকম ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা তো আমি ভাবতেই পারিনি!

কাউণ্ট মৃদু হেসে বললেন—হয় বাপু হয়, দুনিয়ায় অনেক কিছুই হয়, যা তুমি বা আমি বুঝতেই পারি না। যাই হোক, তুমি এবার তোমার বাবাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে চ'লে যাও। ওখানে সব ব্যবস্থাই করা আছে। তাছাড়া তোমরা যাতে ভালভাবে থাকতে পারো, তার জন্য বছরে বার লক্ষ ফ্রাঁর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি আমি! ড্যাংলার কোম্পানির ব্যাঙ্কে চেক্ কাটলেই টাকা পাবে তোমরা।

বৃদ্ধ মেজর কিন্তু একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন কাউণ্টের কাণ্ডকারখানা দেখে। তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হ'লো না।

কাউণ্ট তখন বৃদ্ধের পিঠে মৃদু করাঘাত ক'রে বললেন—আমি বুঝতে পারছি মেজর, বহুদিন পরে ছেলের দেখা পেয়ে আপনি খুবই বেসামাল হয়ে পড়েছেন। তা এ রকম হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যাই হোক, এখন আপনারা আসুন, আমি একটু কাজে বের হবো।

পিতা পুত্র ততক্ষণ আলিঙ্গনমুক্ত হয়েছেন। ওঁরা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই কাউণ্ট আবার বললেন—হ্যাঁ, এখনকার মত যান, তবে আমি শীগ্‌গির আপনাদের সংবর্ধনার জন্য একটা প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করবো। প্যারীর অভিজাত সমাজের সঙ্গে আপনাদের পরিচয়ও হবে ঐ ভোজ-সভাতেই।

এই ব'লেই কাউণ্ট ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কাউণ্ট চ'লে গেলে সপুত্র ক্যাভালকান্টিও ধীরে ধীরে বিদায় হলেন।

* * * *

কয়েক দিন পরের কথা। কাউণ্ট অব মন্টিক্রিষ্টো তাঁর পল্লীভবনে

এক বিরাট প্রীতিভোজের আয়োজন করেছেন। এই পল্লীভবনটি বহুদিন খালি অবস্থায় প'ড়ে ছিল, কিন্তু কাউন্ট এটাকে কিনে নিয়ে একেবারে রাজপ্রাসাদে পরিণত ক'রে ফেলেছেন।

কাউন্টের নিমন্ত্রণে প্যারীর অভিজাত মহলের প্রায় সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ব্যারন ও ব্যারনেস ড্যাংলার, মঁসিয়ে ও মাদাম ভিলেফোর্ট, কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফ, মেজর ক্যাভালকান্টি ও এণ্ডি ক্যাভালকান্টিও ছিলেন।

যথাসময়ে খানা-পিনা শেষ হয়ে যাবার পর ব্যারনেস্ ড্যাংলারের দিকে তাকিয়ে কাউন্ট বললেন—এই বাড়ির দোতলায় একখানা রহস্যময় ঘর আছে, দেখবেন ?

কাউন্টের এই কথায় মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট হঠাৎ বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন—তার চেয়ে চলুন, ব'সে ব'সে গল্প করা যাক্।

কাউন্ট বললেন—কিন্তু ঐ ঘরে আপনারা এমন কিছু দেখতে পাবেন যা এর আগে কখনও দেখেননি। আমি এই বাড়িখানা কিনবার পর যেদিন প্রথম ঐ ঘরে যাই, সেই দিনই কেন যেন আমার মনে হয়েছিল যে, ঐ ঘরে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, অর্থাৎ একটা অমানুষিক পাপকার্যের অনুষ্ঠান হয়েছিল। ঘরটাতে ঢুকলে এখনও যেন মনে হয় যে, ওখানে কোন হতভাগ্যের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট যখন যেতে চাইছেন না, তাহ'লে বরং···

কাউন্টের কথায় বাধা দিয়ে মাদাম ভিলেফোর্ট বললেন—আমরা দেখতে চাই সে ঘর। চলুন।

ঘরখানি ছিল দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে নিয়ে কাউন্ট সেই ঘরের সামনে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটি খুলে ফেললেন। দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। যেন একটি সদ্যোজাত শিশু কেঁদে উঠলো কোথাও।

ভিতরে ঢুকে সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, ঘরখানা অনেকটা সূতিকাঘরের মত সাজানো। ঘরে কোন আলো নেই, জানালা দরজায় লাল পর্দা ঝুলছে। মেঝের উপরে একখানি ছোট

খাট, খাটের পাশে একখানা ছোট টেবিল ও তোয়ালে রাখবার স্ট্যাণ্ড। স্ট্যাণ্ডের উপর একখানা তোয়ালে।

মাদাম ভিলেফোর্ট বললেন—কি বিশ্রী!

তাঁর কথার জের টেনে কাউণ্ট বললেন—শুধু বিশ্রী নয় মাদাম, ভয়াবহ! এই ঘরে, হ্যাঁ, ঠিক এই ঘরে আজ থেকে বিশ বৎসর আগে একটা সাংঘাতিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মাদাম ভিলেফোর্ট হেসে বললেন—সাবধান কাউণ্ট, 'প্রকিওরার ত্ব রোয়া', (রাজকীয় অভিযোক্তা) এখানে উপস্থিত আছেন, সে কথাটি ভুলে যাবেন না যেন!

কাউণ্ট হেসে বললেন—না মাদাম, সে কথা আমি ভুলে যাইনি। তাছাড়া আমার মনে হয় মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট উপস্থিত থাকায় ভালই হয়েছে।

মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট বললেন—কি বলতে চাইছেন আপনি?

কাউণ্ট বললেন—আমি বলতে চাইছি যে, আজ থেকে বিশ বছর আগে এই ঘরে কোন মহিলা একটি সন্তান প্রসব করেন।

—আপনি কি আমাদের কোন রূপকথার গল্প শোনাতে চান নাকি কাউণ্ট! বললেন মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট।

—মোটেই না। আমি বলতে চাই যে, এই ঘরে সেদিন যে ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তার পিতা······তার দুরাচার লম্পট জন্মদাতা, নিজহাতে সেই শিশুটিকে মায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে······

এই সময় হঠাৎ ব্যারনেস্ ড্যাংলার অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কাউণ্ট তাড়াতাড়ি একটি স্মেলিং সল্টের শিশি এনে ব্যারনেসের নাকের কাছে ধ'রে মাথায় হাওয়া দিতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো।

জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি বললেন—আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। আমি বাইরে যেতে চাই।

কাউণ্ট বললেন—তাহ'লে চলুন, এই ঘরের পেছনে যে গোপন সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি দিয়েই বাগানে যাওয়া যাবে।

এই ব'লেই কাউন্ট ঘরের অন্যদিকে গিয়ে একটা গুপ্ত দরজা খুলে ফেললেন।

নিমন্ত্রিতেরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, দরজার সামনেই একটা সরু সিঁড়ি, যার অস্তিত্ব বাইরে থেকে, এমন কি ঘরের ভিতর থেকেও বুঝতে পারা যায় না।

সিঁড়িটা দেখে মেজর ক্যাভালকান্টি বললেন—এটা যেন গোপন সিঁড়ি ব'লে মনে হচ্ছে!

কাউন্ট বললেন—ঠিকই বলেছেন মেজর। এ সিঁড়ির অস্তিত্ব বাইরের কোন লোক জানতো না। এর অস্তিত্ব জানতো শুধু সেই লোক, যে এটাকে তৈরি করিয়েছিল।

—তার মানে? এবারের প্রশ্ন এলো মাদাম ভিলেফোর্ট-এর মুখ থেকে।

—মানে, যে ভদ্রলোক এই সিঁড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন তিনিই ছিলেন সেই হতভাগ্য শিশুর অবৈধ পিতা। এই ঘরে থাকতেন সেই মহিলা, যিনি অবিবাহিতা অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন, আর তাঁরই চিকিৎসা ও প্রসবের জন্য ডাক্তার আর নার্স এই গোপন সিঁড়ি দিয়ে আনাগোনা করতো।

এই পর্যন্ত কথা হ'তেই নীচের বাগানে এসে পড়লেন সবাই।

কাউন্ট কিন্তু তখনও ব'লে চলেছেন। তিনি বললেন—আর এই সিঁড়ি দিয়েই সেই হতভাগ্য শিশুটিকে নিয়ে আসে তার পিতা···

কাউন্টের কথায় বাধা দিয়ে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট বললেন—কি সব যা তা বলছেন কাউন্ট। আপনি কি জানেন না যে, আপনার এই অভিযোগ কি রকম সাংঘাতিক!

—জানি বৈ কি মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট, কিন্তু আমি যা বলছি তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে আমার হাতে।

—প্রমাণ!

—হ্যাঁ, প্রমাণ। আমি জানি যে সেই দুরাচর লম্পট সেদিন সেই সদ্যোজাত শিশুটিকে এই সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এসে ঐ জায়গায় (এই

ব'লে আঙুল দিয়ে একটা কলাগাছের ঝাড়ের দিকে দেখিয়ে ;—হ্যাঁ, ঠিক ঐ জায়গায় তাকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দিয়েছিল।

মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠলেন—মিথ্যা কথা! আপনি কি ক'রে জানলেন এত কথা?

—উত্তেজিত হবেন না মঁসিয়ে প্রকিওরার, শুনে যান। আমার চাকররা ঐ জায়গায় গাছ লাগাবার উদ্দেশ্যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ একটি শিশুর অবিকৃত কঙ্কাল আবিষ্কার করে।

—কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয় নাকি যে, শিশুটিকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছিল?

কাউন্ট মৃদু হেসে বললেন—আপনি বোধ হয় উচ্চাসনে ব'সে প্যারিসের সামাজিক নিয়মকানুনগুলো ভুলে গেছেন। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এই বাগানটি গোরস্থান নয়। তা ছাড়া সদ্যোজাত মৃত শিশুকে কবর দেবার আগে তার মাথাটা কেটে ফেলবার নিয়ম আছে, কিন্তু এখানে যে কঙ্কাল পাওয়া যায়, সেটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

এই কথা শুনে ব্যারনেস্ ড্যাংলার আর একবার আর্তনাদ ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ব্যারনেস্ ড্যাংলারকে এইভাবে দু-দুবার অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে উপস্থিত সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো যেন খুবই দুঃখিত হয়েছেন, এই রকম ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ব্যারনেসের দিকে। তারপর স্মেলিং সল্ট্ এনে তাঁর নাকের কাছে ধরতেই তিনি ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেলেন।

ব্যারনেস্ ড্যাংলারের জ্ঞান ফিরে আসতেই কাউন্ট অত্যন্ত আহত-স্বরে বললেন—আমি খুবই দুঃখিত মাদাম। এ গল্প আপনার সামনে বলা আমার মোটেই উচিত হয়নি।

এই ব'লেই তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মঁসিয়ে ভিলেফোর্টের দিকে তাকালেন।

ঘঁসিয়ে ভিলেফোর্ট তখন কাউকে কিছু না ব'লে ব্যারনেস্ ড্যাংলারকে ধ'রে নিয়ে তাঁর গাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

* * *

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আর্লিন্স-এর এক ছোট্ট টেলিগ্রাফ্ আফিসের সামনে একটি বিদেশী লোককে দেখা গেল। টেলিগ্রাফ্ অফিসটা ছিল একটা পাহাড়ের চূড়ার উপরে। যখনকার কথা হচ্ছে সেই সময় বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ্-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। তখন সংবাদের আদান-প্রদান চলতো পতাকা ও আলোর সাহায্যে। দিনের বেলায় পতাকা আন্দোলিত ক'রে ও রাত্রিকালে আলোকসংকেত ক'রে টেলিগ্রাফ্ করা হ'তো তখন।

যে টেলিগ্রাফ্ আফিসটার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে ছিল একজন মাত্র কেরানী। কেরানীটির বাসাও ছিল ঐ আফিসের সঙ্গেই লাগানো।

বিদেশী লোকটি মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা ক'রে নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন আফিসের মধ্যে!

তাকে দেখে কেরানী জিজ্ঞাসা করলো—কি চান আপনি?

লোকটি মৃদু হেসে বললো—চাই না বিশেষ কিছু, শুধু একটু আলাপ করতে এলাম।

—আলাপ করতে এলেন! কী ব্যাপার বলুন তো?

—বললাম তো, ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। আমি এসেছি আপনাকে কিছু টাকা দিতে, এই ধরুন, পাঁচ লাখ ফ্রাঁ!

—পাঁচ লাখ ফ্রাঁ! বলেন কি?

—ঠিকই বলছি। ইচ্ছা করলে এখনই নিতে পারেন ঐ টাকা। এই কথা ব'লেই তিনি তাঁর হাতের এ্যাটাচি কেসটা খুলে কেরানীর সামনের টেবিলের উপর রাখলেন।

কেরানী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে এ্যাটাচি কেসটা গাদা গাদা ব্যাঙ্ক নোটে ভর্তি।

লোভে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ দুটি। সে বললো—কিন্তু আমাকে এত টাকা কেন দেবেন আপনি!

আগন্তুক হেসে বললো—হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন বটে! কথাটা কি জানেন, আপনাকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। সামান্য কাজ। আর এই সামান্য কাজটা করবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচ লাখ ফ্রাঁ পেয়ে যাবেন আপনি।

—কি টেলিগ্রাম দেখি!

বিদেশী লোকটি তখন তার পকেট থেকে একখানা কাগজ বের ক'রে কেরানীর হাতে দিল।

কাগজখানায় লেখা ছিল…

> "স্পেনের নির্বাসিত রাজা ডন কার্লো বোর্জেস থেকে পালিয়েছেন। সংবাদ পাওয়া গেছে যে, তিনি ক্যাটা-লোনিয়া পার হয়ে স্পেনে ঢুকে পড়েছেন। আরও জানা গেল যে রাজা স্পেনের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার অধিবাসীরা তাঁর পক্ষে যুদ্ধযাত্রা করেছে।"

কাগজখানা প'ড়ে দেখে কেরানী বললো—কী সর্বনাশ! এই টেলিগ্রাম পাঠালে যে আমার চাকরী যাবে!

—তাতে কি হয়েছে? সারা জীবন চাকরী ক'রেও আপনি পাঁচ লাখ ফ্রাঁ রোজগার করতে পারবেন না। তাছাড়া চাকরীই বা যাবে কেন? আজ বেশ কুয়াশা আছে। আপনি বলবেন যে কুয়াশায় টেলিগ্রামের সংকেত ঠিকমত বুঝতে না পেরেই এই রকম ভুল সংবাদ পাঠানো হয়েছে।

কেরানী আমতা আমতা ক'রে বললো—তাহ'লেও চাকরী থাকবে না।

—তা না থাকলেই বা! আপনি এই পাঁচ লাখ ফ্রাঁ নিয়ে আপনার বাকী জীবনটা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়ে দিতে পারবেন।

* * * *

সেই দিনই সন্ধ্যায় সারা প্যারিসে র'টে গেল খবরটা। প্রত্যেক লোকের মুখে শুধু ঐ কথা। খবরের কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ বেরিয়ে গেল স্পেনের নির্বাসিত রাজা ডন কার্লোর প্রত্যাবর্তনের খবর বড় বড় হরফে ছেপে।

এই খবর বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনিস হুণ্ডীর দাম প'ড়ে যেতে

লাগলো। শহরময় হুড়াহুড়ি লেগে গেল ওগুলো বিক্রি করবার জন্য। সবাই বিক্রি করতে চায়, কেনবার লোক কেউ নেই।

ড্যাংলার কোম্পানির আফিসে খবরের পর খবর আসতে লাগলো। যার যত স্পেনিস হুণ্ডী ছিল, সেগুলোকে যে কোন দরে বিক্রি ক'রে দিতে নির্দেশ আসতে লাগলো আমানতকারীদের পক্ষ থেকে।

ড্যাংলার একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মাত্র কয়েক দিন আগে কাউণ্ট অব মন্টিক্রিষ্টোর দেখাদেখি তিনি তাঁর আজীবনের সঞ্চয় ও, এমন কি, ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা থেকেও বহু লক্ষ ফ্রাঁ নিয়ে প্রায় সত্তর লক্ষ ফ্রাঁর স্পেনিস হুণ্ডী কিনেছিলেন।

তিনি তখন বাধ্য হয়ে কম দরে ঐ হুণ্ডীগুলো বিক্রি ক'রে আমানতকারীদের টাকা জমা ক'রে দিলেন।

ফলে নিজস্ব নগদ টাকা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না তাঁর।

এদিকে যুদ্ধের খবরটা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্ট অব মন্টিক্রিষ্টো দালাল লাগিয়ে বাজার থেকে সবগুলো স্পেনিস হুণ্ডী বেনামীতে কিনে ফেললেন।

* * * *

এর পরদিনই এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'লো আগের দিনের খবরটাকে মিথ্যা ও ভুয়া খবর ব'লে ঘোষণা ক'রে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হ'লো—"গতকল্য প্যারিসের সংবাদপত্রসমূহে স্পেনের নির্বাসিত রাজার সম্বন্ধে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা একেবারেই ভিত্তিহীন। কুয়াশার জন্য কোন টেলিগ্রাফ্ আফিসের কেরানী একটা সাংকেতিক সংবাদ বুঝিতে ভুল করিবার জন্যই এইরূপ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।"

এই সরকারী প্রতিবাদ প্রকাশিত হবার ফলে স্পেনিস হুণ্ডীর দাম আবার বেড়ে যেতে লাগলো। অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে, আগে যে দাম ছিল তা থেকেও কিছু বেড়ে গেল স্পেনিস হুণ্ডীর দাম।

কিন্তু এই ব্যাপারে প্যারীর বিখ্যাত ব্যাঙ্কার ব্যারন ড্যাংলার একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন।

স্পেনের রাজার পলায়ন রহস্যের জের মিটবার আগেই আর এক দারুণ খবর প্রকাশিত হ'লো প্যারিসের এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায়।

খবরটির শিরোনামা ছিল—"আলী পাশার হত্যা রহস্য।"

সংবাদদাতা লিখেছিলেন—"জেনিনার সুলতান আলী পাশার মৃত্যু ও জেনিনার পতনের ইতিহাস এতকাল রহস্যাবৃত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি এমন কতকগুলো বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ আমাদের হস্তগত হয়েছে যা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছি যে, আলী পাশাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়। যে নরপশুর বিশ্বাসঘাতকতায় আলী পাশার মৃত্যু হয়, সে ছিল তাঁরই একজন সেনাপতি। খবরাখবর নিয়ে আরও জানা গেছে যে, ঐ বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি শুধু আলী পাশাকে হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হয় নাই, সে তাঁর প্রাসাদটিও অরক্ষিত অবস্থায় শত্রুদের হাতে তুলে দেয়। নাটকের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ঐ বিশ্বাসঘাতক নরপশু আলী পাশার মহিষী ও তাঁর একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস হাইদীকে পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁর বিনিময়ে এক দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে।

গভীর লজ্জার এবং দুঃখের কথা এই যে, ঐ বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি আজ প্যারিসের অভিজাত মহলে কাউন্ট খেতাব নিয়ে সগর্বে বিচরণ করছে।

জনসাধারণ ও সরকারের অবগতির জন্য লোকটির নামও আমরা প্রকাশ করছি। এর আগের নাম ছিল 'ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু', যে বর্তমানে কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফ নামে পরিচিত।"

* * * *

এই সাংঘাতিক সংবাদটি যখন খবরের কাগজে বের হ'লো, মহামান্য কাউন্ট-দ্য মারকার্ফ তখন শাসন-পরিষদের সভায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। ফ্রান্সের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে উচ্চতম পরিষদের সদস্যবৃন্দ রাজাকে সুপরামর্শ প্রদান ক'রে থাকেন কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফ সেই সভার একজন মাননীয় সদস্য।

সভার কাজ তখন চলছে, এই সময় একজন সদস্যকে সংবাদপত্রের একখানি বিশেষ সংখ্যা হাতে নিয়ে রীতিমত উত্তেজিতভাবে সভাকক্ষে প্রবেশ করতে দেখা গেল। মাননীয় সদস্য সোজা সভাপতির কাছে গিয়ে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিম্নকণ্ঠে কি সব ব'লে সেই কাগজখানা তাঁর হাতে দিলেন।

সভাপতিও গভীর মনোযোগের সঙ্গে খবরের কাগজখানা পড়তে লাগলেন।

কাগজখানা পড়বার সময় তাঁর মুখের ভাব মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হ'তে লাগলো। উপস্থিত সদস্যরা কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে মাননীয় সভাপতির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

খবরটা পড়া হয়ে গেলে সভাপতি সদস্যদের দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বভাব-সুলভ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—মাননীয় সদস্যবৃন্দ! এইমাত্র সংবাদপত্রে একটি অতি গুরুতর বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টা এতই গুরুতর এবং বিশেষ ক'রে ঐ সংবাদের সঙ্গে আমাদের এই পরিষদের সম্মান এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, আমি এ ব্যাপারটাকে আপনাদের গোচরে না এনে পারছি না।

এই পর্যন্ত ব'লেই তিনি খবরের কাগজে প্রকাশিত সেই সাংঘাতিক সংবাদটি উচ্চকণ্ঠে প'ড়ে শোনালেন সদস্যদের কাছে।

পড়া হয়ে গেলে, তিনি বললেন—মাননীয় কাউণ্ট-দ্য-মারকার্ফ এখন এখানেই উপস্থিত আছেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করছি, তিনি এই জঘন্য হীন ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংবাদকে অস্বীকার ক'রে সভার সামনে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করুন যে, সংবাদপত্রে যে সব কথা লেখা হয়েছে ওগুলো একেবারেই মিথ্যা।

সভাপতির এই কথায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সবাই সমস্বরে ব'লে উঠলেন—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

কিন্তু কাউণ্ট-দ্য-মারকার্ফের মুখ তখন মৃতের মত পাণ্ডুর ও রক্তহীন হয়ে গেছে। তিনি কোন কথাই বললেন না।

তাঁকে নীরব দেখে সভাপতি আশ্চর্য হয়ে বললেন—সে কি

কাউন্ট ! আপনি চুপচাপ ব'সে কেন ? আপনি যদি প্রকাশ্য সভায় এই সংবাদকে মিথ্যা ব'লে ঘোষণা না করেন তাহ'লে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে হবে !

কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফ তখন শুষ্ককণ্ঠে বললেন—এ নিশ্চয়ই আমার কোন শত্রুর কাজ।

সভাপতি বললেন—শত্রুর কাজই হোক আর মিত্রের কাজই হোক, এই সংবাদের ভিত্তিতে আমি আপনাকে যদি অভিযুক্ত না করি, তাহ'লে রাজার কাছে এবং দেশের কাছে আমাকে কর্তব্যভ্রষ্ট হ'তে হবে। তবে আপনি যদি সংবাদটাকে মিথ্যা ঘোষণা করেন, তাহ'লে আপনাকে জামিনে খালাস দিতে পারি, এই পর্যন্ত !

কাউন্ট মারকার্ফ বললেন—এ সংবাদ মিথ্যা।

তখন সভাপতি বললেন—বেশ ! আপনার ঘোষণার উপরে বিশ্বাস রেখে আপনাকে আমি জামিনে মুক্তি দিচ্ছি। আগামী পরশু এখানেই এই মামলার বিচার আরম্ভ হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের মত দলিলপত্র ও সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আপনি ঐ দিন অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। খবরের কাগজের আফিসেও আমি সমন পাঠাচ্ছি। তাদের অফিসে যদি এই মামলার কোন সাক্ষী থাকে, তাকে পাঠাতে অনুরোধ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে একখানি চিঠিও আমি দিচ্ছি সম্পাদককে।

* * * *

বিচার সভা। বারজন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়েছে এই অসামান্য চাঞ্চল্যকর মামলাটির বিচার করবার জন্য।

কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফকে দেখা গেল আসামীর কাঠগড়ার পাশে একখানা চেয়ারে ব'সে থাকতে। তাঁর হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ।

আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো শেষ হ'তেই সভাপতি বললেন—আসামী ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু ওরফে কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফ ! আপনার বিরুদ্ধে যে সাংঘাতিক অভিযোগ আনা হয়েছে তার প্রতিলিপি আপনাকে আগেই দেওয়া হয়েছে। তবুও আর একবার অভিযোগগুলো আপনাকে শুনিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই ব'লে অভিযোগপত্রটি তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে পাঠ ক'রে তিনি বললেন—আসামী ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু! আপনি দোষী না নির্দোষ?

কাউণ্ট-গু-মারকার্ফ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—নির্দোষ।

—বেশ। তাহ'লে আমি আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি নির্দোষিতা প্রমাণ করতে। আশা করি, আপনি যে নির্দোষ একথা প্রমাণ করতে পারবেন।

—নিশ্চয়ই ধর্মাবতার, আমার কাছে যে দলিলপত্রাদি আছে তা থেকে আমি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করতে পারব যে আমি এ ব্যাপারে একেবারেই নির্দোষ। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহ'লে আমি আমার হাতের এই দলিলগুলো প'ড়ে শোনাতে পারি।

সভাপতি বললেন—পড়ুন।

কাউণ্ট-গু-মারকার্ফ তখন একে একে সেই দলিলগুলো বিচারকদের প'ড়ে শোনাতে লাগলেন।

দলিলগুলো থেকে জানা গেল যে, আলী পাশা তাঁকে এত বেশী বিশ্বাস করতেন যে, নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে রক্ষা করবার ভার পর্যন্ত তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন কি আলী পাশার অন্তঃপুর অবধি তাঁর ছিল অবাধ গতিবিধি।

সভাপতি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন এই সময়—কিন্তু এ থেকে পাশার মৃত্যু বা তাঁর স্ত্রী কন্যার নিরুদ্দেশের কোন খবরই তো জানা যাচ্ছে না।

কাউণ্ট বললেন—তা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সেনা বিভাগের রিপোর্ট থেকে জানতে পারবেন যে আলী পাশার মৃত্যুর পর যখন প্রাসাদ আক্রান্ত হয়, আমি তখন পাশার পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে শত্রুপক্ষের রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এই ব'লে আলী পাশার স্বাক্ষরিত একখানি অনুজ্ঞাপত্র ও সেনা বিভাগের কোন পদস্থ অফিসারের স্বাক্ষরিত একখানি রিপোর্ট আদালতে দাখিল করলেন তিনি।

সভাপতি যখন সেই দলিল দুখানা পড়ছেন, ঠিক সেই সময়ে একজন পত্রবাহক একখানা পত্র এনে তাঁর হাতে দিল।

চিঠিখানা প'ড়ে সভাপতি আশ্চর্য হয়ে পত্রবাহককে বললেন—তাঁকে নিয়ে এসো।

একটু পরেই দেখা গেল একজন বোরখাবৃতা মহিলা একজন পরিচারিকার সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে আদালত কক্ষে প্রবেশ করছেন। মহিলা সভাপতির সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—আপনিই লিখেছেন চিঠিখানা?

বীণানিন্দিত কণ্ঠে সেই বোরখার ভিতর থেকে উত্তর এলো—হ্যাঁ।

সভাপতি বললেন—বেশ! আমরা আপনার কথা শুনবো।

এই বলেই অন্যান্য বিচারকদের লক্ষ্য ক'রে এবং আসামীকে শুনিয়ে তিনি বললেন—এই মহিলা বলছেন যে ইনি পরলোকগত আলী পাশার কন্যা। ইনি এই আদালতে নিজের ইচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে এসেছেন।

সভাপতির মুখ থেকে এই কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আদালত কক্ষে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। বিচারকবৃন্দ দর্শকদল এবং আসামী, সবাই একসঙ্গে তাকালেন সেই বোরখাবৃতা মহিলাটির দিকে।

সভাপতি সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন—আপনার যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহ'লে আপনার মুখের আবরণটা স'রিয়ে ফেলুন।

মহিলাটি তখন তাঁর বোরখা খুলে ফেললেন আদালতে দাঁড়িয়েই। সবাই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী।

সভাপতি তখন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম?

—পিতা বেঁচে থাকতে আমার নাম ছিল জেনিনার শাহজাদীহাইদী।

—'পিতা বেঁচে থাকতে' বলছেন কেন?

—কারণ পিতার মৃত্যুর পর আমাকে এবং আমার মাকে এক দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা হয়।

এই সময় আসামী পক্ষের উকিল হঠাৎ প্রশ্ন করেন—কিন্তু আপনি যে স্বর্গত আলী পাশার কন্যা তার কোন প্রমাণ আছে?

প্রিন্সেস হাইদী মৃদু হেসে বললেন—আছে বৈ কি ! এই দেখুন আমার জন্মের সার্টিফিকেট (Birth Certificate)। আর এই দেখুন আমার বাপ্তাইজ হবার সার্টিফিকেট।

এই ব'লে দুখানা সার্টিফিকেট সভাপতির টেবিলে রাখলেন তিনি।

আসামী পক্ষের উকিল সেই কাগজ দুখানি সভাপতির কাছ থেকে নিয়ে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু আপনার বাবা মুসলমান হয়েও আপনাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

—অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। আপনারা হয়তো জানেন যে, আমার বাবা মুসলমান হ'লেও আমার মা ছিলেন খ্রীষ্টান।

—কিন্তু এ থেকে কি ক'রে বোঝা যায় যে, আপনিই প্রিন্সেস হাইদী ?

—তা যায় না বটে, তবে যাতে জানা যায়, সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে এসেছি। আমার হাতের এই সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান দলিলখানা প'ড়ে দেখলেই আপনারা জানতে পারবেন যে, কি সাংঘাতিক অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের উপরে। আমাকে আর আমার মাকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রি করা হয়েছিল অল কবীর নামে একজন দাস-ব্যবসায়ী মুসলমানের কাছে। পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ দামে আমাদের দুজনকে বিক্রি করা হয়।

এই সময় কোন একজন দর্শক ব'লে উঠলেন—কী সাংঘাতিক !

দর্শকের সেই কথার জের টেনে প্রিন্সেস হাইদী বললেন—শুধু সাংঘাতিকই নয়, এ রকম অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতা সভ্যজগতে বোধ হয় আজ পর্যন্ত আর কোথাও দেখা যায়নি।

এই সময় সভাপতি বললেন—আপনার হাতের ঐ দলিলখানা দেবেন কি ?

—নিশ্চয়ই দেব ধর্মাবতার, কিন্তু দেবার আগে দলিলখানা এই প্রকাশ্য আদালতে একবার প'ড়ে শোনাতে চাই আমি।

এই ব'লেই দলিলখানা পড়তে আরম্ভ করলেন প্রিন্সেস হাইদী—

> "আমি জেনিনার সৈন্যাধ্যক্ষ ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু সজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে নিহত আলী পাশার স্ত্রী ও কন্যাকে নগদ পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁর বিনিময়ে দাস-ব্যবসায়ী অল কবীরের নিকট বিক্রয় করিলাম।"

দলিলখানা পড়া শেষ হ'তেই কাউণ্ট-দ্য-মারকার্ফ আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—মিথ্যা কথা! সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! ও দলিল জাল।

প্রিন্সেস হেসে বললেন—একথা আমি আগেই জানতাম যে, এই দলিলকে জাল বলা হবে, তাই আমি অল কবীরকেও আদালতে নিয়ে এসেছি। মাননীয় বিচারপতির অনুমতি পেলেই তাকে এখানে হাজির করতে পারি।

সভাপতি বললেন—আসতে বলুন তাকে।

সভাপতির অনুমতি পেয়ে প্রিন্সেস হাইদী তাঁর সহচরীকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন। সহচরী সঙ্গে সঙ্গে আদালত থেকে বের হয়ে গেল। একটু পরেই একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো সে।

সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম?

—অল কবীর!

—এই মহিলাকে আপনি চেনেন?

—চিনি ধর্মাবতার।

—কি ক'রে?

—ওঁকে এবং ওঁর মাকে আমার কাছে পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যে বিক্রি করা হয়েছিল।

—এঁর মা এখন কোথায়?

—তিনি মারা গেছেন।

—কে বিক্রি করেছিল এঁদের?

—জেনিনার একজন সেনাধ্যক্ষ। তার নাম ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু।

—দেখুন তো, এখানে সে লোক আছে কি না?

সভাপতির নির্দেশে অল কবীর আদালত কক্ষের চারদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে হঠাৎ কাউণ্ট-দ্য-মারকার্ফের দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে বললো —ঐ সেই লোক!

অল কবীর কাউণ্ট-দ্য-মারকার্ফকে সনাক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গেই আদালত কক্ষে মৃদু গুঞ্জন উঠলো। সেই গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে দুটি কথা স্পষ্টভাবে শোনা গেল—

"বিশ্বাসঘাতক!" "নরপশু!"

সভাপতি তখন আবার বললেন—দেখুন তো, প্রিন্সেস-এর হাতের ঐ দলিলখানা আসল দলিল কি না!

সভাপতির নির্দেশে প্রিন্সেস হাইদীর হাত থেকে দলিলখানা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখে সে বললো—হ্যাঁ ধর্মাবতার, এই সেই দলিল!

এই সময় আসামী পক্ষের উকিল তাকে প্রশ্ন করলো—এ দলিল ঐ মহিলার হাতে কি ক'রে গেল বলতে পারেন?

অল কবীর বললো—না, তা আমি বলতে পারি না। ঐ দলিল আমি কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টোকে দিয়েছিলাম।

—কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টোকে দিয়েছিলেন! কেন বলুন তো?

—মোটা দাম পেয়ে। তিনি আমাকে আট লক্ষ ফ্রাঁ দিয়ে দলিলখানা সহ ঐ মহিলাকে কিনে নিয়েছিলেন।

এই সময় সভাপতি প্রিন্সেস হাইদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—একথা কি সত্য?

—হ্যাঁ, ধর্মাবতার! সম্পূর্ণ সত্য। কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টোই আমার বর্তমান প্রভু।

সভাপতি তখন তীব্র দৃষ্টিতে কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফের দিকে তাকিয়ে জলদগম্ভীরস্বরে বললেন—আপনার কিছু বলবার আছে?

কাউন্ট নীরব।

সভাপতি তখন বিচার-সভার অন্যান্য সদস্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এইবার আপনাদের বলতে হবে, আসামী কাউন্ট-দ্য-মারকার্ফ ওরফে ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু দোষী না নির্দোষ।

সবাই একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন—"দোষী"!

বাইশ

স্পানিশ হুণ্ডীর ব্যাপারে ব্যারন ড্যাংলার সর্বস্বান্ত হ'লেও বাইরে তিনি তা প্রকাশ হ'তে দেন নি। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, আবার তিনি সামলে নিতে পারবেন। তাই এদিকে যখন সারা প্যারিসে ফার্নান্দ্ মণ্ডেগুর মামলা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, সেই অবসরে তিনি ইটালীর কোটীপতি মেজর ক্যাভালকান্টির পুত্র এণ্ড্রি ক্যাভালকান্টির সঙ্গে তাঁর মেয়ে ইউজিনির বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। খুব গোপনেই তিনি এই চালটি চেলেছিলেন, কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এই বিয়ের ফলে মেজর ক্যাভালকান্টির অগাধ ঐশ্বর্য তাঁর ব্যাঙ্কে এনে ফেলে ঐ অর্থের সাহায্যেই আবার অবস্থা ফেরাতে পারবেন। বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

নির্ধারিত দিনে বর-কনে ও আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে গীর্জায় হাজির হলেন ড্যাংলার। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেল।

পুরোহিত "বিবাহ সমাপ্ত হয়েছে" এই কথাটা ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদল পুলিশ সহ একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে হানা দিলেন সেখানে।

ম্যাজিস্ট্রেট এণ্ড্রি ক্যাভালকান্টিকে দেখিয়ে পুলিশ দলকে হুকুম করলেন—গ্রেপ্তার করো ওকে!

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশদল এগিয়ে এসে বরবেশী এণ্ড্রি ক্যাভালকান্টির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ব্যারন ড্যাংলার চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন—এ সব কি হচ্ছে জানতে পারি কি?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—নিশ্চয়ই! পলাতক খুনী আসামী বেন্‌ডে-টোকে গ্রেপ্তার করা হ'লো।

—বেন্‌ডেটো! পলাতক খুনী আসামী! কি বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলেছি ব্যারন। এণ্ড্রি ক্যাভালকান্টি ছদ্মনামে যে লোকটি এখানে উপস্থিত আছে, সে একজন জেলখাটা দাগী এবং পলাতক খুনী আসামী।

এই ব'লে একটু হেসে ম্যাজিস্ট্রেট আবার বললেন—আমি খুবই

দুঃখিত ব্যারন, কিন্তু কি করবো, কর্তব্যের খাতিরে আমি একে গ্রেপ্তার না ক'রে পারি না।

এণ্ড্রিকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউজিনি অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো, আর ব্যারন ড্যাংলার দু'হাতে মুখ ঢেকে ব'সে পড়লেন সেখানে।

এই সময় হঠাৎ কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টো সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে, বহুদিন আগে মার্সেঈ-এর গীর্জায় এক বিবাহ সভাতেও ঠিক এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একটা ক্ষীণ হাসির রেখা তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনের ভাব গোপন ক'রে তিনি ইউজিনির কাছে ছুটে গেলেন।

তিনি দেখলেন—ইউজিনি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

*　　*　　*　　*

ইউজিনির বিয়ের এই মুখরোচক খবরটা পরদিন সকালে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হবার ফলে ড্যাংলার কোম্পানির ব্যাঙ্কে 'রান' আরম্ভ হয়ে গেল।

ড্যাংলার যখন বুঝতে পারলেন যে আর রক্ষা নেই, তখন তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর নোট পকেটস্থ ক'রে পিছনের গুপ্ত দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে যাবার আগে স্ত্রী কন্যার কথা একবার তাঁর মনে হ'লেও, "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" এই প্রবাদবাক্যটি স্মরণ ক'রে, তাদের ফেলে রেখেই পালিয়ে গেলেন তিনি।

*　　*　　*　　*

ইউজিনির বিবাহ সভা থেকে বাড়িতে ফিরতেই কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টো খবর পেলেন যে ভাইকাউণ্ট আলবার্ট তাঁর জন্য বৈঠক-খানায় অপেক্ষা করছেন।

এই খবর শুনে কাউণ্ট বৈঠকখানায় গিয়ে আলবার্টকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—কি খবর ভাইকাউণ্ট! আপনি হঠাৎ?

আলবার্ট বললো—ভদ্রতার মামুলি বুলি কপ্চে দরকার নেই কাউণ্ট, আমি আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাই।

—কৈফিয়ৎ !

—হ্যাঁ, কৈফিয়ৎ। আমার বাবাকে লোকচক্ষে হেয় ক'রে আমাদের বংশের সম্মানকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন আপনি। এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব। আমি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি।

—বেশ ! তাই হবে। আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

—ভাল, কাল সকালেই আমাদের দেখা হচ্ছে তাহ'লে !

সেই রাত্রেই।

কাউণ্ট অব মন্টিক্রিষ্টো অন্যমনস্কভাবে একখানা তলোয়ার হাতে নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করছিলেন, এই সময় এক অবগুণ্ঠিতা মহিলার আবির্ভাব হ'লো সেই ঘরে।

মহিলাটির দিকে তাকিয়ে কাউণ্ট বললেন—আপনি কে মাদাম ?

অপরিচিতা মহিলাটি হঠাৎ তাঁর মুখের উপরের অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন—আমি তোমার কাছে আমার ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি এডমণ্ড !

—আপনি। কাউণ্টেস্-দ্য-মারকার্ফ ! আপনি এখানে ?

—কাউণ্টেস্-দ্য-মারকার্ফ নই এডমণ্ড। আমি মার্সেদেস।

—মার্সেদেস ! না না, সে নেই, সে বহুদিন আগে মারা গেছে। তাছাড়া, আমাকে আপনি এডমণ্ড নামেই বা ডাকছেন কেন ?

কাউণ্টের এই কথায় মার্সেদেস তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে বললো—আমাকে তুমি ক্ষমা করো এডমণ্ড। তুমি যদি জানতে যে কতখানি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমাকে বিয়ে করেছে ফার্নান্দ্… কিন্তু থাক সে কথা, আমি শুধু তোমার কাছে আমার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে এসেছি আজ !

—তুমি তাহ'লে জানতে যে আমিই এডমণ্ড দান্তে।

—হ্যাঁ, এডমণ্ড ! তোমাকে যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে দেখি, সেই দিনই আমি তোমাকে চিনতে পারি ; কিন্তু সে কথা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। তোমার সামনে সেদিন আমি বেরও হইনি। ইচ্ছা ক'রেই বের হইনি। এডমণ্ড ! তুমি যদি জানতে…

—সবই আমি জানি মার্সেদেস। যাই হোক, আমি কথা দিচ্ছি কাল তোমার ছেলে জয়ী হয়ে বাড়িতে ফিরবে। আমিই কাল তার হাতে প্রাণ দেব।

—না, তোমাকে আমি মরতে দেব না।

—সে কি! আমি না মরলে আলবার্ট কি ক'রে জয়ী হবে?

—তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে না। আমি তা হ'তে দেব না। তোমার সঙ্গে আমার ছেলের দ্বন্দ্বযুদ্ধ···এ কিছুতেই হ'তে পারে না; না—না—না।

এই ব'লেই মার্সেদেস ছুটে বেরিয়ে গেল সেই ঘর থেকে। কাউন্ট ধীরে ধীরে হাত থেকে তলোয়ারখানা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন।

* * *

পরদিন সকালেই আলবার্ট এসে দেখা করলো কাউন্টের সঙ্গে। কাউন্টকে একা একটা ঘরে ডেকে নিয়ে সে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে বললো—আমাকে আপনি ক্ষমা করুন কাউন্ট! কাল রাত্রে মায়ের কাছে আমি সব কথা শুনেছি।

কাউন্ট আলবার্টের হাত ধ'রে তুলে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন! তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হ'লো না।

কাউন্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে যেতেই মার্সেদেস তাকে বললো—তৈরী হয়ে নাও আলবার্ট, আমাদের এখনই এ বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। রাস্তায় গাড়ি অপেক্ষা করছে।

যাবার সময় আলবার্ট ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তার বাবার মুখের দিকে তাকালো একবার। তারপর নিঃশব্দে মায়ের সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

ওদের গাড়িখানা ফটক পার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফার্নান্দ পকেট থেকে পিস্তল বের ক'রে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে গুলী করলো।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণহীন দেহটি লুটিয়ে পড়লো মেঝের উপরে।

তেইশ

এদিকে এণ্ড্রি ক্যাভালকান্টির বিচার-সভায় আর এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লো। বিচারক যখন তার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে নিঃসঙ্কোচে প্রকিওরার-দ্য-রোয়া মঁসিয়ে ভিলে-ফোর্টের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—উনিই আবার বাবা।

এরপর আরও যে সব চাঞ্চল্যকর বিবরণ আদালতে প্রকাশ করলো সে, তাতে জানা গেল যে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট একজন দুশ্চরিত্র, লম্পট, জালিয়াৎ এবং নরহত্যাকারী। ব্যারনেস্ ড্যাংলারের সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয়ের কথাটাও ফাঁস হয়ে গেল আদালতে।

এইসব ব্যাপারে সেদিন কোর্ট থেকে পাগলের মত ছুটে এসে মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট সেই যে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন, তারপর দুটো দিন পার হয়ে গেলেও সে দরজা তিনি খুললেন না।

ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে বাড়ির লোকেরা যখন দরজা ভেঙ্গে সেই ঘরে ঢুকলো, তখন দেখা গেল, মঁসিয়ে ভিলেফোর্ট মেঝের উপর দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে নিজের মাথার চুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ছেন। তিনি তখন রীতিমত উন্মাদ।

এইভাবে এডমণ্ডের দুজন শত্রু নিপাত হবার পর বাকি থাকলো শুধু ড্যাংলার। এডমণ্ড জানতে পেরেছিল (এখন থেকে আমরা কাউণ্ট অব মন্টিক্রিষ্টোকে এডমণ্ড ব'লেই অভিহিত করবো) যে ড্যাংলার ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।

সে তখন গোপনে দস্যু-দলপতি লুইগি ভাম্পার সঙ্গে দেখা ক'রে ড্যাংলারকে খুঁজে বের করতে অনুরোধ করলো। লুইগি ভাম্পাকে এডমণ্ড বহুবার বন্ধুভাবে সাহায্য করেছিল ব'লে সে এডমণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল, তাই এডমণ্ডের অনুরোধে সে ভিয়েনার পথ থেকে ড্যাংলারকে ধ'রে এনে কয়েদ ক'রে রাখলো।

চার দিন নির্জলা উপবাসে রাখবার পর ড্যাংলারের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ আদায় ক'রে এক প্লেট খাবার দিলো লুইগি ভাম্পা।

পাঁচ দিনের মাথায় এডমণ্ড এসে তার সঙ্গে দেখা করলো। তাকে দেখে ড্যাংলার অবাক হয়ে বললেন—একি ! আপনি এখানে !

এডমণ্ড বললো—হ্যাঁ ! লুইগি ভাম্পা আমার বিশেষ বন্ধু কি না ! তাই দেখা করতে এসেছি তার সঙ্গে।

এডমণ্ডের কথা শুনে ড্যাংলার যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন—দেখুন দেখি, দস্যুরা আমাকে অকারণে বন্দী ক'রে রেখেছে। আমার সব টাকা কেড়ে নিয়ে আমাকে এরা না খাইয়ে রেখেছে।

এডমণ্ড বললো—আপনার তাহ'লে খুব খিদে পেয়েছে, কেমন ?

—হ্যাঁ কাউণ্ট, ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

—খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?

—খুব।

—তাহ'লে কষ্ট কাকে বলে বুঝতে পারছো কিছু কিছু ? বন্দী-জীবনে না খেয়ে থাকলে মনের অবস্থা কেমন হয় তাও কিছু কিছু বুঝেছো, তাই না ?

কাউণ্টের মুখে এই রকম বেসুরো কথা শুনে ড্যাংলার যেন হকচকিয়ে গেল। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হ'লো না।

এডমণ্ড ব'লে চললো—মনে ক'রে দেখ ড্যাংলার, তুমি একজন নির্দোষ যুবকের কী সর্বনাশ করেছিলে ! জাল চিঠি পাঠিয়ে তাকে তুমি বিয়ের দিনে গ্রেপ্তার করিয়েছিলে, মনে আছে সে কথা ? ভাবতে পারো কি যে, তোমার ষড়যন্ত্রের ফলে সেই হতভাগ্য যুবক কারাগারে ব'সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তিলে তিলে মৃত্যুর জন্য দিন গুনেছে। আর এদিকে তুমি ব্যারন্ সেজে সমাজের বুকের উপর ব'সে অত্যাচারের রথ চালিয়ে নিয়েছো ! তুমি, তোমার বন্ধু ফার্নান্দ্ মণ্ডেগু আর তোমাদের পাপ কাজের সহায়ক ভিলেফোর্ট এই তিন শয়তান একটি নির্দোষ হতভাগ্য যুবকের সর্বনাশ ক'রে কেউ কাউণ্ট, কেউ ব্যারন আর কেউ সরকারী প্রকিওরার সেজে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে চলেছিলে···মনে পড়ে সে সব কথা ?

—আপনি !···কে আপনি···?

—এখনও চিনতে পারছো না আমাকে শয়তান ! আমি সেই, যাকে তুমি বিবাহ-সভা থেকে ধরিয়ে দিয়েছিলে, আমি সেই, যার বাগ্‌দত্তা বধূকে তোমার কুকর্মের সহায়ক ফার্নান্দ্‌ মণ্ডেগু বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে বিবাহ করেছিল ; আমি সেই, যাকে তোমার বন্ধু ভিলেফোর্ট কারাগারে পাঠিয়েছিল তার বাবার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে ; আমি সেই, যে ফার্নান্দের কীর্তি-কাহিনী প্রকাশ ক'রে দিয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। আমি সেই, যে তোমার প্রাণের বন্ধু ভিলেফোর্টের মুখোস খুলে দেওয়ায় সে আজ উন্মাদ······আমি সেই এডমণ্ড দান্তে !

এডমণ্ডের মুখে তার নাম শুনে ড্যাংলারের বুকটা কেঁপে উঠলো। সে তখন তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে ব'লে উঠলো—এডমণ্ড ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

ড্যাংলারের এই কথায় হা—হা ক'রে হেসে উঠে এডমণ্ড বললো—ক্ষমা ! হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমাই করবো !

এই ব'লে লুইগি ভাম্পার দিকে তাকিয়ে সে বললো—আমার এই উপকারী বন্ধুটির আরামের দিকে দৃষ্টি রেখো। কাল সকালে আমি আবার এসে এর সম্বন্ধে যা হয় ব্যবস্থা করবো।

পরদিন সকালে এডমণ্ড এসে আবার যখন দেখা করলো ড্যাংলারের সঙ্গে, তখন ড্যাংলারের মাথার সবগুলো চুল সাদা হয়ে গেছে। এক রাত্রের মধ্যেই তার বয়স যেন ত্রিশ বৎসর বেড়ে গেছে। এডমণ্ড তখন তাঁর হাতে পাঁচটি ফ্রাঁ তুলে দিয়ে বললো—নাও, এই পাঁচ ফ্রাঁ নিয়ে আবার মানুষের সর্বনাশ ক'রে বেড়াও গে। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।

সমাপ্ত